দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্র – বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণের আরও একটি ব্যর্থ প্রয়াস

মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান*

সারসংক্ষেপ

আলোচ্য প্রবন্ধে বিশ্ব ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্র (Poverty Reduction Strategy Paper বা পিআরএসপি) ও আমাদের দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে এর সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর তা করতে গিয়ে প্রবন্ধের প্রথমাংশে দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্রের ধারণা এবং বাংলাদেশের বিদ্যমান দারিদ্র্য পরিস্থিতির একটি বিশে-ষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে দারিদ্র্য নির্মূলে পরিকল্পিত অর্থনীতির গুর"ত্ব এবং এক্ষেত্রে দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্র যে পরিকল্পিত অর্থনীতির বিকল্প হতে পারে না সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। আর অবশেষে দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্রের অসারতা ও করণীয় সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য উপস্থাপনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

ভূমিকা

বিগত শতাব্দীর সত্তর ও আশির দশকে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সংকট এবং সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর ভাঙ্গনকে (যার জন্যে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর ষড়যন্ত্র ও বৈরীতাই মূলতঃ দায়ী) পুঁজি করে সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ এবং তাদের নিয়ন্ত্রিত বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের মত সাম্রাজ্যবাদী সংস্থাগুলো আবারও নব্য-উদারবাদী অর্থনীতির মোড়কে যুগ যুগ আগের বস্তা পঁচা মুক্ত বাজার অর্থনীতির মৌলবাদী দর্শন নিয়ে সরব হয়ে ওঠে। তাদের এ দর্শন তারা গিল্‌তে বাধ্য করে সাম্রাজ্যবাদের তাবেদার সরকারগুলোকে। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোকেও তারা ঋণের টোপ দিয়ে এ দর্শন গিলাতে সমর্থ হয়, যদিও এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতীক্রমী দেশ ছিল বেলারুশ প্রজাতন্ত্র। ওদিকে চীন ও ভিয়েতনামও এ দর্শনকে পুরোপুরি গ্রহণ করে নি। মালয়েশিয়াও বিশ্ব ব্যাংকের পরামর্শকে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করেছে। আর সম্ভবতঃ সেকারনেই ১৯৯৭ এর পূর্ব এশীয় সংকট থেকে চীন, ভিয়েতনাম ও মালয়েশিয়া নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছিল। অন্যদিকে পূর্ব ইউরোপে বেলারুশও অনেকটা সংকটমুক্ত রাখতে পেড়েছে নিজেকে। ভারত অনেক দেরীতে অর্থ্যাৎ নব্বই এর দশকের শুরুতে উদারবাদী দর্শন গ্রহণ করলেও বিশ্ব ব্যাংকের পরামর্শ মানে নি। যেকারণে অব্যাহতভাবে এগিয়েছে, উন্নতি করেছে। স্বল্পোন্নত অন্যান্য দেশসমূহকে বিশ্ব ব্যাংক ঋণের শর্ত হিসেবে এ দর্শনকে (নব্য-উদারবাদী) গিল্‌তে দস্তুরমত বাধ্য করেছে। ফল যা হবার তা-

* অধ্যাপক অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

ই হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের প্রাক্তণ উপনিবেশ এ সকল স্বল্পোন্নত দেশ বর্তমানে তাদের নব্য উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। নব্য-উদারবাদী এ দর্শন সবচেয়ে বেশী ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে সম্ভবতঃ লেটিন আমেরিকার দেশগুলোতে। যে কারণে সেখানে নিয়মতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে বামপন্থীরা (সমাজতন্ত্রীরা) একের পর এক দেশে ক্ষমতাসীন হচ্ছে। ইতোমধ্যেই ভেনিজুয়েলা, ব্রাজিল, উরুগুয়ে, বলিভিয়া, চিলি ও আর্জেন্টিনায় তাঁরা ক্ষমতায় এসেছে। ১৯৭৫ এর ১৫-ই আগষ্ট বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বপরিবারে হত্যা করে সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের দেশেও তাদের নব্য-উদারবাদী দর্শন বাস্তবায়নে হাত দেয়। বিরাষ্ট্রীয়করণ, মৌলিক চাহিদা পূরণ, কাঠামোগত সংস্কার, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং সবশেষে দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্র ইত্যাদি নানান অভিধায় ও নামে তারা তাদের এ দর্শন বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী সংস্থা বিশ্ব ব্যাংকের সকল শর্ত ও পরামর্শ প্রতিপালন করতে গিয়ে বর্তমান জোট সরকার ইতোমধ্যেই আমাদের দেশকে এক ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করে ফেলেছে। রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ আজ সম্পূর্ণরূপে দুর্বৃত্তায়ীত। গরীব মানুষের আয় বাড়ে নি অথচ ব্যয় বেড়েছে কয়েক গুণ। এমতাবস্থায়, দারিদ্র্য দূরীকরণ স্বপ্নই থেকে গেছে। বেড়েছে ধন বৈষম্য। এমনতো হবার কথা ছিল না। আমাদের স্বাধীনতার লক্ষ্য ছিল দারিদ্র্যমুক্ত এবং সমতাধর্মী এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। কেন এমন হল? কেনই বা আমরা পারলাম না? আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা উপরোক্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আলোচ্য প্রবন্ধের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশসমূহে বিশেষ করে বাংলাদেশে সাম্রাজ্যবাদের মুখপাত্র বিশ্ব ব্যাংক নিয়ন্ত্রিত দারিদ্র্য হ্রাসের নামে প্রবর্তিত দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্রের মুখোশ উন্মোচন করা। আর এ লক্ষ্যকে সম্মুখে রেখে আমরা নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করেছি ঃ

১। বাংলাদেশের দারিদ্র্য সমস্যা ও তার নিরসনে দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্রের অসারতা প্রমাণ করা;
২। পরিকল্পিত অর্থনীতির বিকল্প হিসেবে দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্রের অকার্যকারিতা সম্পর্কে আমাদের যুক্তি তুলে ধরা ;
৩। সবশেষে আমাদের দেশের দারিদ্র্য নির্মূলে কি করা উচিত সেসম্পর্কে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা উপস্থাপন করা।

পদ্ধতি ও তথ্য

আলোচ্য প্রবন্ধে ব্যবহৃত তথ্যসমূহ মূলতঃ প্রকাশিত উৎস থেকে নেয়া হয়েছে যার মধ্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা গ্রন্থের বিভিন্ন সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। তা'ছাড়া বিশ্ব ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্র গ্রন্থ এবং বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকীসহ বিভিন্ন সাময়িকী ও দৈনিকে প্রকাশিত এ সম্পর্কিত নিবন্ধ ও প্রবন্ধেরও সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে।

দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্র ও বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি

সাম্রাজ্যবাদী সংস্থা বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বিশ্বের স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে এবার সাহায্য প্রাপ্তির প্রধান শর্ত হিসেবে দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্র প্রণয়ন করতে বলেছে (১২, পৃঃ

১১১; ১৫, ০৫ ঃ ০৩ ঃ ০৬)। তবে গোড়ার দিকে তারা কাজটি শুরু করে চরম দরিদ্র ও ঋণগ্রস্থ দেশগুলোকে দিয়ে। বিগত শতাব্দীর শেষ দিকে বিশেষ করে নব্বইয়ের দশকে তারা এ দেশগুলোর সম্মুখে ঋণ মওকুফের মূলো ঝুলিয়ে দেয়। কিন্তু এমনি এমনি তারা ঋণ মওকুফ করতে রাজি হয় নি। এর সাথে তথাকথিত দারিদ্র্য হ্রাস কৌশলপত্র তৈরীর শর্ত জুরে দেয়। প্রথম দিকে তারা আমাদের দেশকে ঋণ মওকুফের সুবিধা দিতে রাজি হয় নি। কারণ তাদের মতে, বাংলাদেশ চরম ঋণগ্রস্ত দেশ নয়। বাংলাদেশও এ ব্যাপারে তেমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করে নি। ১৯৯৯ সালে এসে দেখা গেল যে, স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল নির্বিশেষে সকল দেশের ক্ষেত্রেই সাহায্য বা ঋণ প্রাপ্তির শর্ত হিসেবে দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্র প্রণয়ন বাধ্যতামূলক করা হয়। ওদিকে ২০০০ সালের ডিসেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ এর ৫৫-তম অধিবেশনে বিশ্বের স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্যে সহাস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য বা মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল স্থির করে যার মূল কথা হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য বিমোচন। ২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্বে দারিদ্র্যের হার অর্ধেকে নামিয়ে আনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এ সংক্রান্ত জাতিসংঘের ঘোষণায়। এ রকম এক পেক্ষাপটে বাংলাদেশ ২০০০ সালের ডিসেম্বরেই অন্তর্বর্তীকালীন দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্র প্রণয়নে উদ্যোগী হয়। ২০০২ সালের এপ্রিল নাগাদ খসড়া দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্র রচনা এবং ঐ বছরের ডিসেম্বরে তা চূড়ান্ত করা হয়। আর ২০০৩ সালের জুলাই থেকে এর আওতায় একটি তিন বছর মেয়াদী দারিদ্র্য হ্রাস কর্মসূচী বাস্তবায়ন শুরু করে। একই সময়ে পূর্ণাঙ্গ দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্র প্রণয়নের কাজ চলতে থাকে এবং ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে তা শেষ হয়। ২০০৫ সালের অক্টোবর নাগাদ পূর্ণাঙ্গ দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্র চূড়ান্ত করা হয় এবং ২০০৬ সালের জানুয়ারীতে বিশ্ব ব্যাংক তা অনুমোদন করে। পূর্ণাঙ্গ এ কর্মসূচীর নাম দেয়া হয়েছে Unlocking the Potential: National Strategy for Accelerated Poverty Reduction, অর্থ্যাৎ সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন ঃ দারিদ্র্য হ্রাসের গতি সঞ্চারি জাতীয় কৌশল।

জাতিসংঘ ঘোষিত সহাস্রাব্দের লক্ষ্যসমূহের আলোকে বাংলাদেশের দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্রে আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে অর্জনের জন্যে নিম্নে উল্লিখিত লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে ঃ

১। *ক্ষুধা, দীর্ঘস্থায়ী খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও চরম দারিদ্র্যের মূলোৎপাটন করে দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করা ;*
২। *দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের অনুপাত অর্ধেকে (৫০%) নামিয়ে আনা ;*
৩। *সকল বালক-বালিকার জন্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করা ;*
৪। *প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা ;*
৫। *শিশু ও পাঁচ বছরের নীচের বাঁচ্চাদের মৃত্যু হার ৬৫% হ্রাস করা এবং শিশু মৃত্যুর ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা ;*
৬। *অপুষ্টিতে আক্রান্ড় শিশুদের অনুপাত অর্ধেকে (৫০%) নামিয়ে আনা এবং এক্ষেত্রে বিদ্যমান লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা ;*
৭। *মাতৃ মৃত্যুর হার ৭৫% হ্রাস করা ;*
৮। *পুনর"ৎপাদনজনিত স্বাস্থ্য সেবা সবার জন্য প্রাপ্তিযোগ্য করা ;*
৯। *দরিদ্র এবং সুবিধাবঞ্চিতদের বিশেষ করে নারী ও শিশুদের বির"দ্ধে সহিংসতা পুরোপুরি বন্ধ করতে না পারলেও উলে-খযোগ্যভাবে হ্রাস করা ;*
১০। *সুসমন্বিত দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশগত ভারসাম্য নিশ্চিত করা এবং জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় এগুলোকে অন্ড়র্ভুক্ত করা।*

উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্যে যেসকল লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় তা সারণী-১ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো। সারণীর তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, আয় দারিদ্র্য ১৯৯০ এর ৫৯% (৫০%) এবং ভিত্তি বছর ২০০২ এর ৫০% (৪০%) থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৫ সালে ২৫% (২০%) এ গিয়ে দাঁড়াবে। আর ১৯৯০ – ২০০২ এবং ২০০২ – ২০১৫ সময়কালে বার্ষিক আয় দারিদ্র্য হ্রাসের হার হচ্ছে যথাক্রমে – ১.৫(–১.৯%) ও –৩.৩% (–৩.৩%)। অন্যদিকে চরম দারিদ্র্যের হার ১৯৯০ ও ২০০০ এর যথাক্রমে ২৮% ও ১৯% থেকে হ্রাস পেয়ে ৯.৫% এ গিয়ে ঠেকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে, অর্থাৎ বার্ষিক – ৩.৩% হারে চরম দারিদ্র্য হ্রাস পাবে বলে ধরা হয়েছে। বয়স্ক সাক্ষরতার হার ২০০২ এর ৪৯.৬% থেকে বার্ষিক ৬.৩% হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫ সালে গিয়ে ৯০% এ ঠেকবে। প্রাথমিক শিক্ষায় নিবন্ধীকরণের হার ২০১৫ সালে ১০০% হবে বলে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে এবং মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তা ২০০২ এর ৫২.৮% থেকে বার্ষিক ৬.১% হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫ সালে গিয়ে ৯৫% এ দাঁড়াবে। শিশু মৃত্যুর হার ১৯৯০ এর প্রতি হাজারে ৯৪ এর স্থলে ২০১৫ সালে মাত্র ১৮ এ গিয়ে ঠেকবে। আর পাঁচ বছরের নিচের শিশুদের ক্ষেত্রে অনুরূপ অংকগুলো হবে যথাক্রমে ১০৮ ও ২৫। অপরদিকে মাতৃ মৃত্যুর হার ১৯৯০ এর প্রতি লাখে ৫৫৪ থেকে বার্ষিক – ৫.৮% হারে হ্রাস পেয়ে ২০১৫ সালে মাত্র ৯৮ জনে গিয়ে ঠেকবে। গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯০ এর ৫৬ বছর থেকে ২০১৫ সালে ৭৩ বছর হবে বলে ধরা হয়েছে। সবশেষে কম ওজনের শিশুর হার ১৯৯০ এর ৬৭% থেকে কমে ২০১৫ সালে ২৬% হবে বলে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সারণী ১ : বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্রের প্রধান লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্যে প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ, ১৯৯০ – ২০১৫ সময়ে

সূচকসমূহ	১৯৯০	২০০২ ভিত্তি বছর	১৯৯০–২০০২ সময়ে বার্ষিক	২০১৫	২০০২–২০১৫ সময়ে বার্ষিক অগ্রগতি, %
১	২	৩	৪	৫	৬
১। আয় দারিদ্র্য (%)	৫৯ (৫০)	৫০* (৪০)	-১.৫ (-১.৯)	২৫ (২০)	- ৩.৩ ৩.৩)
২। চরম দারিদ্র্য (%)	২৮	১৯*	- ৩.২	৯.৫	- ৩.৩
৩। বয়স্ক সাক্ষরতা (%)	৩৫	৪৯.৬	৩.৫	৯০	৬.৩
৪। প্রাথমিক পর্যায়ে নিবন্ধীকরণ (%)	৫৬	৮৬.৭	৪.৬	১০০	১.২
৫। মাধ্যমিক পর্যায়ে নিবন্ধীকরণ (%)	২৮	৫২.৮	৭.৪	৯৫	৬.১
৬। শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে)	৯৪	৫৩	- ৩.৬	১৮	- ৫.১
৭। পাঁচ বছরের নীচে মৃত্যু হার (প্রতি হাজারে)	১০৮	৭৬	- ২.৫	২৫	- ৫.২
৮। মাতৃ মৃত্যু হার (প্রতি লাখে)	৫৫৪	৩৯০	- ২.৫	৯৮	- ৫.৮
৯। গড় আয়ু (বছর)	৫৬	৬৪.৯	১.৩	৭৩	১.০
১০। জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি (%)	২.১	১.৪	-	১.৩	-
১১। কম ওজনের শিশুর হার (%)	৬৭	৫১*	- ২.৪	২৬	- ৩.৩

* ২০০০ সালের তথ্য। বন্ধনীর মধ্যের তথ্য বিকল্প হিসেবের তথ্য।

উৎসঃ ৭, পৃঃ ১৯০ এর ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত।

বর্তমান সরকারের দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্রের উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহ ও লক্ষ্যমাত্রাগুলোর উপরে কোন রকম মন্তব্য করার পূর্বে আমরা নিম্নে বাংলাদেশের বিদ্যমান দারিদ্র্য পরিস্থিতির একটি বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ উপস্থাপন করবো ।

দারিদ্র্যের সংজ্ঞা নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে (৬) । পুঁজিবাদের সমর্থক অর্থনীতিবিদরা দারিদ্র্য পরিমাপের জন্যে কতগুলো স্থুল সূচক ব্যবহার করে থাকেন, যেমন– মাথাপিছু আয়, মাথাপিছু ক্যালরী গ্রহণ, সাক্ষরতার হার, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার প্রাপ্তি ইত্যাদি । আসলে এটা হচ্ছে দারিদ্র্যকে আড়াল করারই একটা অপচেষ্টা । কারণ দেশের সব আয়কে মানুষের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে যে আয় পাওয়া যায় তাতে সর্বহারা, ভূমিহীন ও কর্মবঞ্চিত মানুষের কিছু যায় আসে না । আবার নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্যালরীর নীচে গ্রহণ করলেই দারিদ্র্য বা চরম দরিদ্র্য বলা হচ্ছে । প্রশ্ন হচ্ছে সেটা কত নীচে হবে? শূন্য পর্যন্ত হবে নাকি ১ এ এসে শেষ হবে । অন্যান্য সূচকের ক্ষেত্রেও এ রকম প্রশ্ন করা যায় । অপরদিকে সমাজতন্ত্রের সমর্থক অর্থনীতিবিদরা মনে করেন যে, মানুষের মৌলিক অধিকার হচ্ছে মোট ছয়টি ঃ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান । আর সেজন্যেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে মানুষের এ মৌলিক অধিকারগুলো স্বল্পতম সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করে থাকে । জাতিসংঘ ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত তিনটি জিনিসকে (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান) মানুষের মৌলিক চাহিদা বা অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও ঐ বছর এর সাথে আরও দু'টি অধিকারের (শিক্ষা ও স্বাস্থ্য) স্বীকৃতি দেয় । আসলে কিন্তু দেয় নি । কারণ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর চাপে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হলেও পুঁজিবাদী ধারায় এগুলোর বাস্তবায়ন কখনই সম্ভব নয় । আর অন্যটি যা বাকীগুলোর বাস্তবায়নে নিয়মকী ভূমিকা রাখে, অর্থাৎ কর্মসংস্থান এর নিশ্চয়তা দেয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কখনই সম্ভব নয় তা সে মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রই (প্রায় ৬% মানুষ বেকার) হোক, ফ্রান্সই (প্রায় ২০% মানুষ কর্মহীন, অভিবাসীদের মধ্যে প্রায় ৫০%) হোক, বা জাপানই (প্রায় ৭% মানুষ কর্মহীন) হোক । আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কোনও পুঁজিবাদী দেশ নিজেকে বেকারত্বমুক্ত দেশ হিসেবে ঘোষণা দিতে পারেনি এবং ভবিষ্যতেও পারবে না । অতএব, আমরা বলতে পারি যে, বেকারত্ব যেখানে থাকবে দারিদ্র্যও সেখানে অবশ্যাম্ভাবীভাবে থাকবে । সুতরাং আমাদের মতে, দারিদ্র্য হচ্ছে এমন এক অবস্থা যেখানে মানুষ তার ছয়টি মৌলিক অধিকার বা চাহিদা ঃ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান থেকে বঞ্চিত থাকে ।

আমাদের দেশেও দারিদ্র্য পরিমাপের ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত স্থুল পদ্ধতিগুলোই ব্যবহার করা হয়ে থাকে । বর্তমানে বাংলাদেশে আয় দারিদ্র্য (income poverty) ও মানব দারিদ্র্য (human poverty) এ দু'ভাবে দারিদ্র্যকে পরিমাপ করা হয়ে থাকে । আয় পদ্ধতিতে মাথাপিছু আয় ও ব্যয় এবং জমির মালিকানার মত বিষয়গুলোকে বিবেচনা করা হয় এবং মানব দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির মত বিষয়গুলোকে প্রধান্য দেয়া হয় । উভয় পদ্ধতিই জরিপের উপর নির্ভরশীল । আর সেকারণে প্রাপ্ত ফলাফলের গ্রহণযোগ্যতা অনেকটাই সীমিত বা প্রশ্নবিদ্ধ হতে বাধ্য । বাংলাদেশে সর্ব প্রথম খানা ব্যয় জরিপ করা হয় ১৯৭৩ – ৭৪ সালে (১) । এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে আরও কয়েকটি জরিপ পরিচালিত হয় । সর্বশেষ খানা আয়-ব্যয় জরিপ চালানো হয় ২০০০ সালে । উল্লেখ্য যে, ২০০০ সালের পূর্বে খানা জরিপে শুধু ব্যয় সংক্রান্ত উপাত্ত সংগ্রহ করা হত । ১৯৯১ – ৯২ পর্যন্ত পরিচালিত খানা ব্যয় জরিপে দেশের দারিদ্র্য পরিমাপের জন্য খাদ্য শক্তি গ্রহণ (food energy intake বা FEI) এবং প্রত্যক্ষ ক্যালরী গ্রহণ (direct calorie intake বা DCI) পদ্ধতি অনুসরণ করা হতো । দারিদ্র্য পরিমাপে জনপ্রতি প্রতিদিন ২১২২ কিলো ক্যালরীর নীচে খাদ্য গ্রহণকে অনপেক্ষ দারিদ্র্যসীমা

(absolute poverty line) এবং ১৮০৫ কিলো ক্যালরীর নীচে খাদ্য গ্রহণকে চরম দারিদ্র্যসীমা (hard-core poverty line) হিসেবে গণ্য করা হয়। ১৯৯৫ – ৯৬ সালে পরিচালিত খানা জরিপে প্রথমবারের মত মৌলিক চাহিদা ব্যয় (cost of basic needs বা CBN) পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। এ পদ্ধতিতে দারিদ্র্যসীমা পরিমাপে খাদ্য-বহির্ভূত (non-food) ভোগ্য পণ্যও অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ২০০০ সালের জরিপে একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো সাধারণতঃ প্রতি চার বছর পর পর খানা জরিপ চালিয়ে দারিদ্র্য পরিস্থিতি নির্ণয় করে থাকে। তবে ১৯৯৪ সাল থেকে বাৎসরিক ভিত্তিতে দারিদ্র্যাবস্থা পরিবীক্ষণের জন্যে দারিদ্র্য পরিবীক্ষণ জরিপ (poverty monitoring survey বা PMS) চালু করা হয়। ২০০৪ সালের মার্চে সর্বশেষ দারিদ্র্য পরিবীক্ষণ জরিপ চালানো হয়। এ জরিপে খাদ্য শক্তি গ্রহণ এবং প্রত্যক্ষ ক্যালরী গ্রহণ এ দু'টি পদ্ধতিই ব্যবহার করা হয়। এতে শহর ও পল্লী অঞ্চলের জন্য পৃথক দারিদ্র্যসীমা নির্ধারণ করা হয় ঃ খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত ভোগ্য পণ্যের চাহিদার ভিত্তিতে শহর অঞ্চলের জন্য জনপ্রতি মাসিক মোট ব্যয় ৯০৫.৯০ টাকা এবং পল্লী অঞ্চলের জন্য জনপ্রতি মাসিক মোট ব্যয় ৫৯৪.৬০ টাকা ধরে দারিদ্র্যসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। নিম্নে আমরা এ জরিপের আলোকে প্রাপ্ত বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির সর্বশেষ চিত্র উপস্থাপন করবো।

সারণী ২ : খাদ্য শক্তি গ্রহণ এবং প্রত্যক্ষ ক্যালরী গ্রহণ পদ্ধতিতে বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির তুলনামূলক চিত্র, ১৯৯৯ – ২০০৪ সময়ে

অঞ্চল	পদ্ধতি			
	খাদ্যশক্তি গ্রহণ, মাথা গণনার হার (%)		প্রত্যক্ষ ক্যালরী গ্রহণ, মাথা গণনা হার (%)	
	১৯৯৯	২০০৪	১৯৯৯	২০০৪
১	২	৩	৪	৫
১। পল্লী	৪৪.৯	৪৩.৩	৪৫.৬	৪০.১
২। শহর	৪৩.৩	৩৭.৯	৪৯.৯	৪৩.৬
৩। জাতীয়	৪৪.৭	৪২.১	৪৬.২	৪০.৯

উৎসঃ ১, ২ ও ৩, পৃঃ ১৬৫, ১৫৬ ও ১৪০ এর ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত।

সারণী – ২ এ উপস্থাপিত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ এ পাঁচ বছরের ব্যবধানে খাদ্য শক্তি গ্রহণ ও প্রত্যক্ষ ক্যালরী গ্রহণ উভয় পদ্ধতিতেই বাংলাদেশের দারিদ্র্য কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। তবে প্রথম পদ্ধতি (২.৬%) অপেক্ষা দ্বিতীয় পদ্ধতিতে (৫.৩%) একটু বেশী কমেছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। অঞ্চল ভেদেও দেখা যাচ্ছে প্রবণতা একই, অর্থাৎ শক্তি গ্রহণ পদ্ধতিতে পল্লী অঞ্চলে এ সময়ে দারিদ্র্য কমেছে যেখানে ১.৬%, সেখানে প্রত্যক্ষ ক্যালরী গ্রহণ পদ্ধতিতে হ্রাস পেয়েছে ৫.৫%। আর শহর অঞ্চলের ক্ষেত্রে অনুরূপ অংকগুলো হচ্ছে যথাক্রমে ৫.৪% ও ৬.৩%। লক্ষ্যনীয় যে, উভয় পদ্ধতিতেই উক্ত সময়ে পল্লী অঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য হ্রাসের হার একটু বেশী। সার্বিকভাবে বলা যায় যে, গড়ে বার্ষিক কম-বেশী ১% হারে দারিদ্র্য কমেছে। তবে আপেক্ষিক অংকে সামান্য হ্রাস পেলেও প্রকৃতপক্ষে মোট দরিদ্র মানুষের সংখ্যা এ সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের হিসেবে খাদ্য শক্তি গ্রহণ পদ্ধতিতে এ সময়ে দরিদ্রদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩.০৭ মিঃ (২০০৪ ঃ (১৪০০.৪২১) = ৫৮.৯৪ – ১৯৯৯ ঃ (১২৫০.৪৪৭) = ৫৫.৮৭); আর ক্যালরী গ্রহণ পদ্ধতিতে প্রায় অপরিবর্তীত

থেকেছে ঃ –০.৪৯ মিঃ (২০০৪ ঃ (১৪০০.৪০৯) = ৫৭.২৬ – ১৯৯৯ ঃ (১২৫০.৪৬২) = ৫৭.৭৫)। এ তো গেল প্রথম দারিদ্র্য সীমার নীচে অবস্থানকারী দরিদ্রদের চিত্র। দ্বিতীয় দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী দরিদ্রদের সংখ্যাও এখনও উল্লেখ করার মতই। ২০০৪ সালে ২৫.১৮ মিঃ (১৮.৭%) মানুষ চরম দারিদ্র্যের শিকার ছিল (সারণী – ৩)।

সারণী ৩ : প্রত্যক্ষ ক্যালরী গ্রহণ পদ্ধতিতে বাংলাদেশের চরম দারিদ্র্য পরিস্থিতির চিত্র, ১৯৯৯-২০০৪ সময়ে %

ক্যালরীর পরিমাণ, কিলো ক্যালরী	অঞ্চল	বছর	
		১৯৯৯	২০০৪
১	২	৩	৪
১৮০৫	১। পল্লী	২৪.৫	১৮.২
	২। শহর	২৭.৩	২০.৮
	৩। জাতীয়	২৪.৯	১৮.৭

উৎসঃ ১, ২ ও ৩, পৃঃ ১৬৫, ১৫৬ ও ১৪০ এর ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত।

সারণী ৪ : বাংলাদেশে দারিদ্র্যের গভীরতা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্যের চিত্র, ১৯৯৯ – ২০০৪ সময়ে

অঞ্চল	বছর			
	১৯৯৯	২০০৪	১৯৯৯	২০০৪
	দারিদ্র্য ব্যবধান	বর্গকৃত দারিদ্র্য ব্যবধান	দারিদ্র্য ব্যবধান	বর্গকৃত দারিদ্র্য ব্যবধান
১	২	৩	৪	৫
১। পল্লী১১.১	৪.০	১০.৯	৩.৮	
২। শহর১১.২	৪.২	১১.১	৪.৫	
৩। জাতীয়	১১.১	৪.১	১০.৯	৩.৯

উৎসঃ ১, ২ ও ৩ পৃঃ ১৬৫, ১৫৬ ও ১৪০ এর ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত।

এক্ষেত্রে আবার বৈষম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে, অর্থাৎ ঐ বছর শহর এলাকায় যেখানে ২০.৮% মানুষ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করতো, সেখানে পল্লী এলাকায় একটু কম ১৮.২% মানুষ অনুরূপ অবস্থার শিকার ছিল। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, পল্লী, শহর ও জাতীয় তিন ক্ষেত্রেই ১৯৯৯ এর তুলনায় ২০০৪ সালে প্রায় ছয় শতাংশ হারে চরম দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে ঃ যথাক্রমে ৬.২%, ৬.৫% ও ৬.৩% হারে, অর্থাৎ বার্ষিক এক শতাংশের মত চরম দারিদ্র্য কমেছে বলে প্রতিয়মান হচ্ছে। অপরদিকে সারণী – ৪ এ উপস্থাপিত তথ্য থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, দারিদ্র্যের গভীরতা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য খুব সামন্যই হ্রাস পেয়েছে। দারিদ্র্য ব্যবধান মূলতঃ দারিদ্র্যরেখা থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গড় দূরত্ব ও দারিদ্র্যের গভীরতা পরিমাপ করে। আর বর্গকৃত দারিদ্র্য ব্যবধান সাধারণত ঃ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য প্রকাশ করে। ১৯৯৯ সালে জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য ব্যবধান যেখানে ছিল ১১.১, সেখানে ২০০৪ সালে তা গিয়ে দাঁড়ায় ১০.৯ এ। শহর ও পল্লী অঞ্চলের ক্ষেত্রে

অনুরূপ অংকগুলো ছিল যথাক্রমে ১১.২ ও ১১.১; ৪.২ ও ৪.৫ এবং ১১.১ ও ১০.৯; ৪.০ ও ৩.৮। লক্ষ্যনীয় যে, একমাত্র শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে দারিদ্র্য বৈষম্য বরং কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির বিশ্লেষণে আর একটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি। আর তা হচ্ছে এই যে, বিশেষ দু'একটি এলাকায় এর কেন্দ্রীভূত হওয়া (সারণী – ৫)। সারণী – ৫ এর তথ্য বলছে যে, দারিদ্র্যর দিক থেকে রাজশাহী বিভাগ প্রথম স্থানে আছে। এখানে ২০০৪ সালে ৬১.৬% মানুষ দারিদ্র্যের শিকার ছিল। দারিদ্র্য ব্যবধান ও বর্গকৃত দারিদ্র্য ব্যবধানও এখানে সবচেয়ে

সারণী ৫ : বিভাগ ভিত্তিক বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির চিত্র, ২০০৪ সালে

বিভাগ	মাথা গণনার হার (%)	দারিদ্র্য ব্যবধান	বর্গকৃত দারিদ্র্য ব্যবধান
১	২	৩	৪
১। বরিশাল	৩৯.৩	১১.১	৪.৩
২। চট্টগ্রাম	৬৩.৩	০৮.১	২.৭
৩। ঢাকা	৩৩.০	০৭.৭	২.৬
৪। খুলনা	৪৬.৪	১১.৫	৪.১
৫। রাজশাহী	৬১.৬	১৮.১	৬.৯
৬। সিলেট	২৮.৪	০৮.০	২.৯
জাতীয়	৪২.১	১০.৯	৩.৯

উৎসঃ ১ ও ৩, পৃঃ ১৬৬ ও ১৪১ এর ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত।

বেশী, যথাক্রমে ১৮.১ ও ৬.৯। দারিদ্র্যের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে আছে খুলনা বিভাগ যার ক্ষেত্রে অনুরূপ অংকগুলো হচ্ছে যথাক্রমে ৪৬.৪%, ১১.৫ ও ৪.১। লক্ষ্যণীয় যে, এ দু'টি বিভাগের ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট সূচকগুলো জাতীয় অনুরূপ সূচকসমূহের বেশ উপরে অবস্থান করছে। আর বাকী চারটি বিভাগের ক্ষেত্রেই তা জাতীয় সূচকসমূহের নীচে অথবা কাছাকাছি অবস্থান করছে। আমাদের দেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির অনুধাবনে আর একটি জিনিষ অত্যন্ত সহায়ক বলে আমরা মনে করি। আর তা হচ্ছে

সারণী ৬ : ভূমির মালিকানার ভিত্তিতে বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির চিত্র, ২০০৪ সালে %

ভূমির মালিকানা, একরে	পল্লী	শহর	জাতীয়
১	২	৩	৪
১। ভূমিহীন	৫৭.৮০	৪৫.৫৩	৫১.৯৪
২। ছোট =১.৯৯	৪৫.৯৪	৩৮.৮৮	৪৪.৬২
৩। মাঝারী ২.০ – ৪.৯৯	২৮.৩৬	২১.৫৩	২৭.৩৫
৪। বড় ৫.০ +	২২.১১	০৯.০১	২০.০১
মোট	৪৩.৩	৩৭.৯	৪২.১

উৎসঃ ১ ও ৩, পৃঃ ১৬৬ ও ১৪১ এর ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত।

এই যে, এখানে দারিদ্র্য প্রবণতা ও মালিকানাধীন ভূমির পরিমাণের মধ্যে অত্যন্ত ঋণাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান (সারণী – ৬)। সারণী – ৬ এর তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে ভূমিহীনদের মধ্যে দারিদ্র্য প্রবণতা সবচেয়ে বেশী – ৫১.৯৪%। মালিকানাধীন ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রুপে দারিদ্র্যও হ্রাস পাচ্ছে। ছোট ভূমি মালিকদের মধ্যে, অর্থাৎ যাদের ভূমির পরিমাণ ১.৯৯ একর বা তার কম তাদের মধ্যে ৪৪.৬২% মানুষ দরিদ্র। আর ২ একর থেকে ৪.৯৯ একর পর্যন্ত ভূমি মালিকদের, অর্থাৎ মাঝারী মালিকদের ক্ষেত্রে অনুরূপ অংকটি হচ্ছে মাত্র ২৭.৩৫% এবং বড় মালিকদের, অর্থাৎ ৫ একর ও তার বেশী ভূমি মালিকদের মধ্যে মাত্র ২০.০১% মানুষ দরিদ্র। এ ক্ষেত্রে আবার পল্লী ও শহর এলাকার মধ্যে বৈষম্য বিদ্যমান। শহরের তুলনায় গ্রামে দারিদ্র্যের প্রবণতা অনেক বেশী।

মানব দারিদ্র্য পরিমাপের একটি পদ্ধতি হচ্ছে সাক্ষরতার হার। এক্ষেত্রেও বাংলাদেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় (সারণী – ৭)। সারণী – ৭ এ উপস্থাপিত তথ্য বলছে যে, বাংলাদেশের অর্ধেকেরও বেশী মানুষ এখনও অক্ষরজ্ঞানহীন। বয়সভিত্তিক কাঠামো অনুযায়ী এক্ষেত্রে কিছুটা বৈষম্য বিদ্যমান। যেমন, ২০০১ সালে পাঁচ বছর ও তদূর্ধ্বের বয়সীদের মধ্যে যেখানে সাক্ষরতার হার ৪২.৫% ছিল, সেখানে সাত বছর ও তদূর্ধ্বের এবং পনের বছর ও তদূর্ধ্বের বয়সীদের ক্ষেত্রে অনুরূপ অংকগুলো ছিল যথাক্রমে

সারণী ৭ : বাংলাদেশে সাক্ষরতার চিত্র, ২০০১ – ২০০৪ সময়ে %

লিঙ্গ	সাক্ষরতা, ৫ বছর ও তদূর্ধ্ব		সাক্ষরতা, ৭ বছর ও তদূর্ধ্ব		সাক্ষরতা, ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব	
	আদমশুমারী	দারিদ্র্য পরিবীক্ষণ জরিপ	আদমশুমারী	দারিদ্র্য পরিবীক্ষণ জরিপ	আদমশুমারী	দারিদ্র্য পরিবীক্ষণ জরিপ
	২০০১	২০০৪	২০০১	২০০৪	২০০১	২০০৪
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১। মহিলা	৩৮.৩	৪০.৪	৪০.৮	৪২.৯	৪০.৮	৪৩.৩
২। পুরুষ	৪৬.৪	৪৮.৪	৪৯.৬	৫১.১	৫৩.৯	৫৫.০
৩। উভয়	৪২.৫	৪৪.৪	৪৫.৩	৪৭.০	৪৭.৫	৪৯.২

উৎসঃ ২, পৃঃ ১৬৮ এর ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত।

৪৫.৩% ও ৪৭.৫%। তিন বছরের ব্যবধানে, অর্থাৎ ২০০৪ সাল নাগাদ সর্বক্ষেত্রে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র দু'শতাংশের মত। তার মানে বার্ষিক এক শতাংশেরও কম হারে সাক্ষরতা বাড়ছে। বয়সভিত্তিক ২০০৪ সালে সাক্ষরতার ক্ষেত্রে অনুরূপ অংকগুলো ছিল যথাক্রমে ৪৪.৪%, ৪৭.০% ও ৪৯.২%। সারণী – ৭ এর তথ্য থেকে আর একটি বিষয় পরিষ্কার যে, সাক্ষরতার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে এখনও লিঙ্গ বৈষম্য বিদ্যমান। যেমন, ২০০১ সালে বয়সভিত্তিক মহিলাদের ক্ষেত্রে সাক্ষরতার হারগুলো ছির যথাক্রমে ৩৮.৩%, ৪০.৮% ও ৪০.৮%; আর পুরুষদের ক্ষেত্রে অনুরূপ অংকগুলো ছিল যথাক্রমে ৪৬.৪%, ৪৯.৬% ও ৫৩.৯%। এখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, পুরুষরা সাক্ষরতার দিক দিয়ে মহিলাদের তুলনায় অনেকখানি এগিয়ে আছে এবং বয়স কাঠামোভিত্তিক এ ব্যবধান ক্রমান্বয় বৃদ্ধি পেয়েছে ঃ ২০০১ সালে পাঁচ ও তদূর্ধ্বের বয়সী পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে সাক্ষরতার হার যেখানে ছিল ৪৬.৪% ও ৩৮.৩%, সেখানে সাত বছর ও তদূর্ধ্বের এবং পনের বছর ও তদূর্ধ্বের বয়সী পুরুষ ও

মহিলাদের ক্ষেত্রে অনুরূপ অংকগুলো ছিল যথাক্রমে ৪৯.৬% ও ৪০.৮% এবং ৫৩.৯% ও ৪০.৮% । তার মানে দাঁড়াচ্ছে এই যে, প্রথম বয়স কাঠামোতে মহিলারা পুরুষদের চেয়ে ৮.১%, দ্বিতীয় বয়স কাঠামোতে ৮.৮% এবং তৃতীয় বয়স কাঠামোতে ১৩.১% পিছিয়ে আছে সাক্ষরতার দিক দিয়ে । মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, প্রথম বয়স কাঠামোর তুলনায় দ্বিতীয় বয়স কাঠামোতে দুই শতাংশের মত মহিলা সাক্ষরতা বৃদ্ধির পর স্থির হয়ে গেছে, অর্থাৎ তৃতীয় বয়স কাঠামোতেও একই ছিল সাক্ষরতার হার । অপরদিকে পুরুষদের ক্ষেত্রে বয়স কাঠামোভিত্তিক সাক্ষরতার হার অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে । আবার তিন বছরের ব্যবধানে, অর্থাৎ ২০০৪ সালে এসেও প্রায় একই প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে এ ক্ষেত্রে । মহিলা সাক্ষরতার ক্ষেত্রে ২০০১ সালের তুলনায় ২০০৪ সালে প্রথম বয়স কাঠামোর চেয়ে দ্বিতীয় বয়স কাঠামোতে দুই শতাংশের মত সাক্ষরতা বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হলেও তৃতীয় বয়স কাঠামোতে এসে প্রায় অপরিবর্তিই থেকে গেছে । আর পুরুষ সাক্ষরতার ক্ষেত্রে তা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে উক্ত সময়ে । সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ এখনও শিক্ষা বঞ্চিত এবং এক্ষেত্রে মহিলারা সবচেয়ে বেশী বঞ্চনার শিকার ।

মানব দারিদ্র্য পরিমাপের আর একটি সূচক হচ্ছে চিকিৎসা সুবিধা বা স্বাস্থ্য সেবা । সারণী – ৮ এর তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে ১৯৯৯ – ২০০৪ সময়ে স্বাস্থ্য সেবার সার্বিক উন্নতি হয়েছে । যেমন, ১৯৯৯ সালে আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার ১৮.৪% অসুস্থ ছিল যা হ্রাস পেয়ে ২০০৪ সালে ১৫.৮% এ গিয়ে ঠেকে । দরিদ্র ও অদরিদ্র জনগোষ্ঠির ক্ষেত্রে ঐ অংকগুলো ছিল যথাক্রমে ১৭.৪% ও ১৫.৩% এবং ১৯.৩% ও ১৬.১% । তার মানে দরিদ্র–অদরিদ্র নির্বিশেষে বার্ষিক এক শতাংশের অনেক কম হারে অসুস্থ মানুষের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে । তবে এ ক্ষেত্রেও পল্লী ও শহারাঞ্চলের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বা বৈষম্য লক্ষ্যণীয় । শহরাঞ্চলে রোগীর অনুপাত পল্লী এলাকার তুলনায় কিছুটা কম হলেও ১৯৯৯ – ২০০৪ সময়ে তেমন কোনও পরিবর্তন হয় নি । আর পল্লী এলাকায় অসুস্থ মানুষের অনুপাতটা যেমন শহরাঞ্চলের চেয়ে কিছুটা বেশী, তেমনি উক্ত সময়ে তা হ্রাসের হারটাও কিছুটা বেশী । মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, দরিদ্রদের চেয়ে অদরিদ্রদের মধ্যে অসুস্থ মানুষের অনুপাত বেশী এবং সর্বক্ষেত্রেই এটা সত্য । অথচ কে না জানে যে, আমাদের দেশের প্রায় দুই থেকে তিন কোটি মানুষ শুধু অন্ধত্ব ও যক্ষার শিকার যাদের শতকরা আশি ভাগেরও বেশী হচ্ছে দরিদ্ররা । আর্সেনিক ও অপুষ্টিজনিত অন্যান্য অসুস্থতার কথা না-ই বা বললাম । অতএব, যেমনটা ইতোমধ্যেই উপরে উল্লেখ করেছি যে, বাংলাদেশ সরকারের অর্থনৈতিক সমীক্ষা গ্রন্থের এ তথ্য নিয়ে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে ।

সারণী ৮ : বাংলাদেশের স্বাস্থ্য পরিস্থিতির সার্বিক চিত্র, ১৯৯৯ – ২০০৪ সময়ে

অঞ্চল	অসুস্থ জনসংখ্যার অংশ, %					
	১৯৯৯			২০০৪		
	দরিদ্র	অদরিদ্র	মোট	দরিদ্র	অদরিদ্র	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬ ৭	
১ । পল্লী	১৮.৭	২০.৩	১৯.৬	১৫.৪	১৭.১	১৬.৪
২ । শহর	১৫.০	১৭.৬	১৬.৪	১৪.৭	১২.৯	১৩.৬
৩ । জাতীয়	১৭.৪	১৯.৩	১৮.৪	১৫.৩	১৬.১	১৫.৮

উৎসঃ ২, পৃঃ ১৬৯ এর ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত ।

যাহোক বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির উপরোক্ত বিশ্লেষণের আলোকে এখন আমরা সরকারের দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্রের আকাংখাসমূহ নিয়ে আলোচনা করবো এবং বাস্তবতার সাথে একটু মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করবো ।

দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্রটির মৌলিক দুর্বলতা হলো এই যে, এটি বাংলাদেশের দারিদ্র্যের কাঠামো ও ব্যবস্থাগত কারণের দিকে আদৌ নজর দেয় নি । এতে দারিদ্র্যের শিকড় সন্ধানের কোন চেষ্টাই করা হয় নি । এতে দারিদ্র্য নিরসনের কৌশল হিসেবে প্রধানতঃ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে । আর এ কাজটি সম্পাদনের ভার দেয়া হয়েছে বেসরকারী খাতের উপর । সরকার শুধু সহায়কের ভূমিকা পালন করবে । বস্তুতপক্ষে এ ধরনের বস্তাপচাঁ পুঁজিবাদী তত্ত্ব কথা আমরা বিগত শতাব্দীর সেই ষাটের দশক থেকেই শুনে আসছি । তখনও বলা হতো যে, প্রবৃদ্ধি হলেই তা চুয়িয়ে পড়বে গোটা দেশে এবং তাতেই উন্নতি হবে এবং দারিদ্র্য দূর হবে । কিন্তু বিগত সাড়ে তিন দশকের অভিজ্ঞতা বলছে যে, প্রবৃদ্ধির মাত্রা উঁচু হলেই তা দারিদ্র্য দূরীকরনে কোন ভূমিকা রাখে না, যদি না তার সঙ্গে যুক্ত হয় নতুন সৃষ্ট সম্পদের ন্যায্য বন্টনের বিষয়টি । বাজার অর্থনীতি কখনই তা নিশ্চিত করতে পারে না । এখানেই আসে রাষ্ট্রের গণমুখী নীতি নির্ধারণ ও তার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের কথা । কিন্তু কেবল বাংলাদেশ কেন কোন নয়া উদারবাদী রাষ্ট্রই এই ন্যায্য বন্টনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারবে না । কারণ ব্যবস্থাটি নিজেই সে পথে একটি বড় বাধা হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে । মুখে মুখে সরকার ও দাতাগোষ্ঠী যতই দারিদ্র্য অভিমুখী প্রবৃদ্ধির কথা বলুক না কেন, আসলে তা ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কিছুই না । তথাকথিত দারিদ্র্য অভিমুখী প্রবৃদ্ধির উদ্দেশ্য দারিদ্র্য দূর করা নয়, তাকে খানিকটা হ্রাস করা এবং মোটামুটি সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনা । সর্বোপরি, তথাকথিত এই দারিদ্র্য অভিমুখী প্রবৃদ্ধির মতাদর্শিক ধারনায় সমতার কোনও ঠাঁই নেই । এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দরিদ্রদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে প্রদত্ত উচ্ছিষ্টের পরিমাণ খানিকটা বাড়িয়ে দেয়া ।

দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টির উপায় হিসেবে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের বিকাশের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে । আমরা বিশ্বাস করি যে, ঐ একই ব্যবস্থাগত প্রতিবন্ধকতার কারণে এরও বাস্তবায়ন সম্ভব নয় । অন্যদিকে অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে যে, তথাকথিত বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় প্রত্যাশিত কর্মসংস্থান বৃদ্ধির বদলে বরং নতুন নতুন বেকারত্বের সৃষ্টি হচ্ছে । বিগত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকের শুরুতে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের পরামর্শে ঢালাও এবং একতরফাভাবে আমদানী উদারীকরণের ফলে আমাদের ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প বড় ধরনের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় । সেই প্রক্রিয়া অদ্যাবধি চলছে । ফলশ্রুতিতে লাখ লাখ শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে । ২০০৩ সালে উপরোক্ত পরামর্শদাতাদের অর্থে মাইডাস পরিচালিত জাতীয় পর্যায়ের এক জরিপ প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে, শুধুমাত্র জরিপ পূর্ববর্তী পাঁচ বছরে বাংলাদেশে সাড়ে পাঁচ লাখেরও বেশী ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে এবং এর ফলে প্রায় সাড়ে বাইশ লাখ মানুষ কর্মচ্যুত হয়েছে (১৫, ০৫. ০৩. ০৬) । আমদানী উদারীকরনের অভিঘাতেই মূলতঃ এসব শিল্প প্রতিষ্ঠান টিকে থাকতে পারে নি । এ ছাড়া ঢালাও বেসরকারীকরণ নীতি বাস্তবায়নের ফলে দেশী শিল্পখাত প্রায় ধ্বংসের মুখে পড়েছে । এর ফলে বহু দেশীয় শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে এবং বেকার হয়ে পড়েছে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী । অথচ দাতাগোষ্ঠীর কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার শর্ত পূরণ করতে গিয়ে সরকার অব্যাহতভাবে আমদানী উদারীকরণ ও বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া অত্যন্ত জোরেশোরেই চালিয়ে যাচ্ছে । বাংলাদেশ সরকারের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাম্প্রতিককালের তথ্যে দেখানো হয়েছে যে, দেশে বেকারের সংখ্যা তিন কোটির

মত। বলতেই হবে এটা অত্যন্ত রক্ষণশীল পরিসংখ্যান। প্রকৃত বেকারের সংখ্যা অবশ্যই অনেক অনেক বেশী। আমাদের মতে অর্ধবেকার ও কার্যত বেকারসহ বাংলাদেশের বেকারের সংখ্যা সাত কোটি ছাড়িয়ে গেছে বহু আগেই। সবচেয়ে আশংকার কথা হলো এ সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছেই। এ বিপর্যয় থেকে উদ্ধার করার জন্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পকে যে প্রটেকশন দেয়া প্রয়োজন তা-ও নয়া উদারবাদী রাষ্ট্রের পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। কারণ তথাকথিত বিশ্বায়নের মোড়ল দেশসমূহ ও তাদের বশংবদ বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও বিশ্ব বানিজ্য সংস্থা তা করতে দেবে না কিছুতেই। তদুপরি দারিদ্র্য নিরসনে শুধু কর্মসংস্থান সৃষ্টিই যথেষ্ট নয়, তার স্থায়িত্বশীলতাও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা আজকের তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বাজার অর্থনীতিতে নিশ্চিত করা একেবারেই অসম্ভব। তা'ছাড়া অর্থবহ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে শ্রমিকের মজুরী এবং সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির বিষয়টিও বিবেচনায় নেয়া আবশ্যক। বিশেষ করে কৃষি শ্রমিকের মজুরীর বিষয়টি বিশেষ নীতি-প্রণয়ন ও বিবেচনার দাবী রাখে। তা না হলে কার্যকরভাবে আমাদের দেশের দারিদ্র্য বিমোচন কখনই সম্ভব হবে না। বাংলাদেশের কর ব্যবস্থার আমূল সংস্কার প্রয়োজন এবং একে দরিদ্র-অভিমুখী করা দরকার। কর ব্যবস্থা অবশ্যই যেন দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা রাখে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আর সেজন্যে সাধারণ মানুষের ঘাড়ে অপ্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ করের বোঝা না চাপিয়ে সমাজের বিত্তবানদের উপর আরও বেশী প্রত্যক্ষ কর আরোপ করতে হবে। তা না হলে দারিদ্র্য নিরসনে যে পদক্ষেপই নেয়া হোক না কেন তা কোন কার্যকর প্রভাব রাখবে না। কারণ কর ব্যবস্থায় এ ধরনের পরিবর্তন আনা না হলে দরিদ্র জনগোষ্ঠির আয় আরও সংকুচিত হয়ে পড়বে এবং তাদের ক্রয় ক্ষমতা আরও হ্রাস পাবে। ফলে দরিদ্ররা কখনই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, সরকারের দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্র অত্যন্ত চাতুরতার সাথে এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে কার্যত পাশ কাটিয়ে গেছে।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এর প্রণয়ন পদ্ধতি। আসলে বাংলাদেশের তথাকথিত দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্র হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী দাতাগোষ্ঠির চাপিয়ে দেয়া এবং তাদের নির্দেশিত ও তাদের স্বার্থে প্রণিত একটি কৌশল পত্র। আমাদের দেশের দারিদ্র্য হ্রাসের ব্যাপারটি হচ্ছে এর মুখোশ মাত্র। এটা রচিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল কর্তৃক সরবরাহকৃত সোর্সবুকের আলোকে, যাতে সুনির্দিষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্র রচনার প্রক্রিয়াটি কেমন হবে এবং কী কী উপাদান এতে থাকবে। এতে আরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, কৌশল পত্রটি তৈরী করতে হবে বিশ্ব ব্যাংকের কম্প্রিহেনসিভ ডেভেলপমেন্ট ফ্রেমওয়ার্কের ভিত্তিতে। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এসব নির্দেশনা ও রূপরেখায় অন্যান্য অনেক কিছুর সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এর প্রণয়ন প্রক্রিয়াটিকে হতে হবে কান্ট্রিড্রিভেন বা দেশজাত। কিন্তু আমাদের প্রশ ঃ একই সময়ে একটি প্রক্রিয়া কিভাবে ডোনার-ড্রিভেন বা দাতাজাত ও কান্ট্রিড্রিভেন বা দেশজাত হতে পারে? আসলে কান্ট্রিড্রিভেন বা দেশজাত ব্যাপারটিও একটি মুখোশ। বলা হয়েছে তা নাকি সম্ভব হয়েছে প্রক্রিয়াটিকে অংশগ্রহণমূলক করার মাধ্যমে। কিন্তু পূর্বাহ্নেই যেখানে রূপরেখা ঠিক হয়ে ছিল, উপাদানও নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল, সেখানে অংশ গ্রহণের কোনও সুযোগ আর থাকলো কি বাংলাদেশের জন্যে? আসলে তথাকথিত দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্র প্রণয়নকারী এমন একটি দেশও নেই, যেখানে এ অংশ গ্রহণের ব্যাপারটি প্রশ্নবিদ্ধ হয় নি। সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের নাগরিক সমাজ কৌশল পত্রের প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাত্রা ও গুণাগুণ নিয়ে অসন্তোষ ও নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। আমাদের দেশেও আমাদের জানামতে কিছু ভাড়াটিয়া দালাল ও আমলা ছাড়া কৌশল পত্র রচনার সাথে সাধারণ মানুষ দূরের কথা শিক্ষিত সমাজেরও কোন

সম্পৃক্ততা ছিল না। তারপরও প্রশ্ন উঠে ঃ সবার অংশগ্রহণ বা সম্পৃক্ততা থাকলেই বা কী হতো? সাম্রাজ্যবাদী উপরোক্ত দাতা সংস্থা দু'টোর দেয়া নীল নকশার বাইরে যাওয়ার কি কোন সুযোগ ছিল? নিশ্চয়ই না। কারণ সেরকম কিছু ঘটলে বিশ্ব ব্যাংকের নির্বাহী বোর্ডের অনুমোদনের জন্যেই তা পাঠানো হতো না, নাকোচ হয়ে যেত ঢাকার অফিস থেকেই। অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের তথাকথিত দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্রের প্রকৃত মালিক হচ্ছে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল। আর বাংলাদেশ সরকার হচ্ছে এর বাস্তবায়নকারী সংস্থা মাত্র।

দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্রে নির্ধারিত লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের জন্যে মূলতঃ বেসরকারী খাত ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাসমূহের ভূমিকার উপর অতি মাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আমাদের জানামতে বেসরকারী খাত ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কোন দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে পারে নি এবং পারবেও না। ১৯৭৫ এর আগষ্ট (বঙ্গ বন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয় ১৫-ই আগষ্ট ১৯৭৫ সালে) পরবর্তী সময় থেকে আজ পর্যন্ত বেসরকারী খাতের ভূমিকা সন্দেহাতীতভাবে আমাদেরকে হতাশ করেছে। এ দেশে বেসরকারী খাত বিকশিত হয়েছে মূলতঃ রাষ্ট্রীয় খাতকে পুঁজি করে। পঁচাত্তর পরবর্তী সামরিক ও বেসামরিক সরকারগুলো বেসরকারী খাতের বিকাশের নামে রাষ্ট্রীয় খাতের ব্যাংকের টাকা অবাধে লুণ্ঠন করতে সহায়তা করেছে, ব্যক্তিগত খাতকে কর মওকুফ সুবিধা দিয়েছে এবং প্রতিটি বাজেটে তাদের জন্যে নগদ সহায়তার (রপ্তানীতে উৎসাহ প্রদানের নামে) নামে বিপুল অংকের টাকা বরাদ্দ রেখেছে। এ ছাড়াও তারা শুল্ক মওকুফ সুবিধা ভোগ করেছে। এই যে হাজার হাজার কোটি টাকার আর্থিক সুবিধা বেসরকারী খাত রাষ্ট্র তথা সরকারের কাছ থেকে নিয়েছে বা নিচ্ছে এগুলো কিন্তু সব জনগণের টাকা। বিনিময়ে তারা জনগণকে কি দিয়েছে? দিয়েছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকার খেলাপী ঋণ, যার মধ্যে কুড়ি হাজার কোটি টাকা সম্ভবতঃ ইতোমধ্যেই মওকুফ করে দেয়া হয়েছে নানা অজুহাতে। দিয়েছে শোষণ, বঞ্চনা ও দারিদ্র্য। ধ্বংস করেছে বস্ত্র শিল্পকে। ধ্বংস করেছে দরিদ্রদের পরিবহণ রেল ও নৌ পরিবহণ ব্যবস্থাকে। বলতে গেলে এ তালিকা অনেক দীর্ঘ হবে। আলোচ্য প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে এ সম্পর্কে আর কথা বাড়াবো না। অন্যদিকে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা বা এনজিও পদ্ধতি প্রথম উদ্ভাবিত হয়েছিল সমাজতন্ত্রকে ঠেকানোর জন্যে বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে। তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র জনগণ যাতে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার চাপে বিদ্রোহী হয়ে না ওঠে এবং সামাজতন্ত্রের দিকে আকৃষ্ট না হয়, সেজন্যে এই ব্যবস্থার দ্বারা দরিদ্র দেশগুলোর তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত এনজিওগুলোর ওপর নির্ভরশীল কিছু আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। নারী ও বেকার যুবকদের বামপন্থী কৃষক-শ্রমিক আন্দোলন থেকে সরিয়ে রাখাই ছিল এর মূল লক্ষ্য। এদের কলকাঠি নাড়ত কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী দেশগুলো এবং তাদের বশংবদ বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক ও মধ্য প্রাচ্যের সুলতান-বাদশা নামধারী চরম রক্ষণশীল শাসক-গোষ্ঠী। ঠান্ডা যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সাম্রাজ্যবাদীদের ভাষায় তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ তথাকথিত "সমাজতান্ত্রিক হুমকি" থেকে মুক্ত হওয়ায় তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এনজিওগুলোর প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় – তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে তার পাশাপাশি এমন একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করা, যাতে প্রয়োজন পড়লে রাজনৈতিক সরকারগুলোকে তারা ইচ্ছামতো চালনা করতে পারে এবং কথা না শুনলে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করতে পারে। আমাদের দেশে বর্তমানে কোন কোন এনজিও বিশালত্বে এবং প্রভাব-প্রতিপত্তিতে এমন "বিকল্প" সরকার হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, অনেকে ইতোমধ্যেই আশংকা প্রকাশ করেছেন, সাধারণ নির্বাচনের সময় তারা বশীভূত ভোটারদের দ্বারা যেকোন দলকে ক্ষমতায় রাখা বা অপসারনের শক্তি

অর্জনের পর্যায়ে গিয়ে পৌছাতে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশে জঙ্গীবাদের উত্থান ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিনষ্টের কাজে একশ্রেণীর ইসলামী ব্যাংক ও এনজিওর ভূমিকা স্মর্তব্য (১৬, ২৯ ঃ ০৩ ঃ ০৬)।

এনজিওগুলো সম্পর্কে আর একটি কথা না বললেই নয়। আর তা হচ্ছে তাদের ক্ষুদ্র ঋণ বা মাইক্রো ক্রেডিট কার্যক্রম। এর মূল উদ্দেশ্য যতটা না দারিদ্র্য দূর করা তার চেয়ে বেশী হচ্ছে কায়েমী স্বার্থ গ্রুপ বা ভেষ্টেড ইন্টারেষ্ট গ্রুপ সৃষ্টি করা। আর তাই তো আমরা প্রতিনিয়ত খবরের কাগজে ও টিভিতে দেখতে পাই তাদের ঘন ঘন বিদেশ সফরের খবর। কি জন্যে তারা বিদেশ সফর করেন? সম্ভবতঃ ক্ষুদ্র ঋণের সাফল্য বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে এবং সাম্রাজ্যবাদের ধারক-বাহক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাত করার জন্যে। একদিকে আমরা লক্ষ্য করছি যে, সার্ভিস চার্জের নামে ক্ষুদ্র ঋণের জন্য তারা বিপুল অংকের সুদ আদায় করছে ঋণ গ্রহীতাদের কাছ থেকে; আর অন্যদিকে দেখছি বিশাল বিশাল ভবন নির্মান করে ভাড়া দিচ্ছে এবং বহুমুখী সব বানিজ্যিক কর্মকান্ডে জড়িত হয়ে পড়ছে ক্রমান্বয়ে। এখানেই তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের আশংকা। ইদানিং তৃতীয় শক্তির আবির্ভাব নিয়ে যখন কথা হচ্ছে, তখন সাম্রাজ্যবাদীদের শেখানো তথাকথিত সুশাসন ও উন্নয়নের রোড ম্যাপের (পুঁজিবাদী) জিকির তুলে পাঁচ তারকা হোটেলের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে সমবেত হয়ে তারাই যে সেই তৃতীয় শক্তি সেকথাও তারা ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে। অবশ্য দেশব্যাপী তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠায় আপাততঃ তারা কৌশলে কিছুটা পরিবর্তন আনলেও লক্ষ্য অর্জনে তারা অটল বলেই মনে হচ্ছে। কারণ এ ক্ষেত্রে তারা সামরিক ও বেসামরিক আমলা চক্রের সমর্থন পাচ্ছে। এনজিওগুলোর এসব কর্মকান্ড থেকে প্রমানিত হচ্ছে যে, দরিদ্রদের দারিদ্র্য বিমোচন তাদের লক্ষ্য নয়, তাদের লক্ষ্য হচ্ছে নিজেদের দারিদ্র্য বিমোচন এবং সাম্রাজ্যবাদের তাবেদার হিসেবে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের দারিদ্র্য কিছু সময়ের জন্যে প্রশমিত করে সমাজতন্ত্রের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করা। প্রশ্ন হচ্ছে কতদিন পারবে তারা একাজ করতে? শেষ বিচারে সফল হবে কি? আমরা বিশ্বাস করি হবে না। ল্যাটীন আমেরিকার ঘটনাবলী ও পার্শ্ববর্তী দেশ নেপালের ঘটনাবলী তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্রে অবকাঠামোর কথা বলতে গিয়ে রেল ও নৌ যোগাযোগের ব্যাপারে প্রায় নিরবতা পালন করেছেন এর রচয়িতারা। অথচ কে না জানে যে, স্থল পরিবহণের ও যোগাযোগের সবচেয়ে সস্তা, দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হচ্ছে রেল পথ এবং নৌ পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা হচ্ছে সকল প্রকার পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে সবচেয়ে সস্তা। প্রকৃতি আমাদেরকে উদার হস্তে নৌ ও সামুদ্রিক পরিবহণ ও যোগাযোগের সুবিধা দান করেছিল ঃ বাংলাদেশের গোটা দক্ষিণ সীমান্ত সাগরের দিকে উন্মুক্ত এবং আভ্যন্তরীণভাবে গোটা বাংলাদেশ চারটি শক্তিশালী নদী প্রণালী দ্বারা আবৃত (গঙ্গা-পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা, মেঘনা ও কর্ণফুলী)। দুঃখের বিষয় যে, স্বাধীনতার পয়ত্রিশ বছরেও আমরা প্রকৃতি প্রদত্ত এ সকল সুযোগ-সুবিধার কানাকড়িও কাজে লাগাতে পারি নি। কৌশল পত্রে প্রায় তিন লক্ষ কিঃ মিঃ রাস্তা বানানোর ব্যাপারে প্রসংশাসূচক অনেক কথা বলা হয়েছে ; অথচ রেলের ব্যাপারে প্রায় নিরবতা অবলম্বন করা হয়েছে। তিন লক্ষ কিঃ মিঃ রাস্তার নীচে যে লক্ষ লক্ষ হেক্টর মূল্যবান কৃষিজমি নষ্ট হয়েছে সেব্যাপারে কোনও হিসেব নিকেশ করা হয় নি কৌশল পত্রে। অন্যদিকে রেলের মাধ্যমে রাজধানী ঢাকাকে যদি চৌষট্টিটি জেলা শহরের সাথে সংযুক্ত করা যেত এবং বড় বড় বিশেষ করে রাজধানী ও বিভাগীয় শহরগুলোকে কেন্দ্র করে কমিউটার ট্রেন সার্ভিস গড়ে তোলা যেত তা'হলে কি পরিমাণ উপকার হতো তারও কোনও হিসেব করেন নি কৌশল পত্র প্রণেতারা। অথচ আমরা সবাই

জানি উপরোক্ত দু'টো পরিবহণ ও যোগাযোগ মাধ্যমই দরিদ্র-বান্ধব এবং উন্নয়ন বান্ধবও বটে। দেশের অভ্যন্তরে অর্থনৈতিক সচলতা বা ইকোনমিক মোবিলিটি বৃদ্ধিতে এগুলো হচ্ছে অদ্বিতীয় (১৩)।

দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্রে সুশাসনের কথা বলা হয়েছে ; অথচ বর্তমান জোট সরকারের দুঃশাসন নিয়ে কোন কথাই বলা হয় নি। বিএনপি-জামাত জোট সরকারের বিগত সাড়ে চার বছরের তথাকথিত কুশাসন ও অপশাসনে দেশ আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌছেছে। দেশের প্রত্যেকটি খাত আজ সংকট ও নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতির শিকার। তবে জোট সরকার সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করেছে জনপ্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার। ২০০১ এর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক উপজেলা নির্বাচন না করে; বরং অনির্বাচিত ও অপ্রয়োজনীয় গ্রাম সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। আর গ্রাম সরকারগুলো সম্পূর্ণরূপে সরকার দলীয় ক্যাডারদের দিয়ে গঠন করা হয়েছে। এর ফলে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদগুলোর কর্মকান্ড অনেকটাই ঝিমিয়ে পড়েছে। কারণ প্রায়শই কর্তৃত্ব নিয়ে গ্রাম সরকারগুলো ইউনিয়ন পরিষদের সাথে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছে। ব্যাহত হচ্ছে পল্লী এলাকার উন্নয়ন কর্মকান্ড। গত বছরই গ্রাম সরকার আইনকে অবৈধ এবং সংবিধান পরিপন্থী হিসেবে ঘোষণা করেছে হাইকোর্ট। অবশ্য সরকার এ রায়কে সুপ্রিম কোর্টে নিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছে অদ্যাবধি। ক্ষমতায় এসেই জোট সরকার আর একটি তোঘলোকী কাজ করে। আর তা হচ্ছে এই যে, সরকার দলীয় সাংসদ, মন্ত্রী ও বশংবদদের নির্বাহী নির্দেশে স্থানীয় মন্ত্রীর দায়িত্ব দেয়া হয়। এর ফলে স্থানীয় প্রশাসন বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে নি। সবকিছুই নিষ্ক্রীয় হয়ে পড়লো। সরকারী দলের ক্যাডাররা সবাই নিজেদেরকে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ভাবতে শুরু করলো। আমলারা হয়ে পড়লো একেবারেই নিরুপায়। এ সকল নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারী মন্ত্রীদের হুকুম তালিম করাই হয়ে পড়লো তাদের একমাত্র কাজ। এরই অবধারিত ফল স্বরূপ বিগত সাড়ে চার বছর ধরে গোটা বাংলাদেশে চলছে দখল, জবরদখল, হামলা, মামলা, খুন, ধর্ষণ, রাহাজানি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি ও দুর্নীতির মচ্ছব। সাংসদ আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর ২০০৩ সালের এক মামলার রায়ে ইদানিং হাইকোর্ট উপরোক্ত নির্বাহী আদেশকেও অবৈধ ও অসাংবিধানিক ঘোষণা করেছে। অন্যদিকে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক দুর্নীতি দূর করার জন্যে চার বছরের মাথায় জোট সরকার বুড়ো, অক্ষম এবং সম্পূর্ণ দলীয় লোকদের সমন্বয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করেছে। এক বছরের বেশী সময় অতিবাহিত হয়েছে; অথচ এ দুর্নীতি দমন কমিশন আদৌ কোন কাজ করে নি। এটা গোটা জাতির সাথে এক ধরনের তামাশা ছাড়া আর কিছুই না। আসলে যে সরকার দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, সে সরকার কখনই দুর্নীতির বিচার চাইতে পারে না। আর সেকারণেই সম্ভবতঃ দুর্নীতি দমনের নামে এরকম একটি বাহাস করেছে সরকার। সুশাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা ও স্বাধীন সংবাদ মাধ্যমের উপস্থিতি। বর্তমান বিএনপি-জামাতের জোট সরকার ২০০১ সালের নির্বাচনের সময়ে বিচার বিভাগ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা দেবে বলে এ দেশের জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। অথচ মেয়াদের শেষ প্রান্তে এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বিচার বিভাগ তো স্বাধীন হয়ই নি ; বরং একে অত্যন্ত নগ্নভাবে দলীয়করণ করা হয়েছে এবং সরকার নিজেই আদলত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছে। স্বাধীন সংবাদ মাধ্যমকে বলা হয়ে থাকে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ। অথচ সাংবাদিক ও সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদের নির্যাতনে জোট সরকার শুধু দেশে নয় সারা বিশ্বে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। ১৯৯১ ও ২০০১ এর নির্বাচনী অঙ্গীকার ছিল বিটিভি ও বাংলাদেশ বেতারকে স্বায়ত্বশাসন প্রদানের। তখনও এ অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করে নি বিএনপি। আর এবারে তো সে অঙ্গীকারের কথা স্মরণও করছে না। বিটিভি ও বাংলাদেশ বেতারকে এখন বিএনপি ও জামাতের একান্তই দলীয় প্রচার যন্ত্রে রূপান্তরিত করা হয়েছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ব্যক্তি খাতের

প্রবক্তারা এবারে ক্ষমতায় এসে ব্যক্তি মালিকানার একমাত্র টিভি চ্যানেল একুশে টিভিকে শুধু বন্ধ করেই খান্ত হয় নি ; এর মালিক, পরিচালক ও কলা-কুশলী ও সাংবাদিকদের চরমভাবে নির্যাতন ও হেনস্তা করেছে। এমন কি এর বিদেশী মালিক আমাদের মহান মুক্তি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিখ্যাত বৃটিশ সাংবাদিক সায়মন ড্রিংককে অত্যন্ত নির্মম ও অসম্মানজনকভাবে বাংলাদেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। মামলা করেছে একুশে টিভির বিরুদ্ধে। বর্তমানে এ চ্যানেলটি সকল মামলা থেকে মুক্ত হওয়ার পরও সরকার নানা তালবাহানায় এর সম্প্রচারের লাইসেন্স দিচ্ছে না। অথচ চার বছর পূর্বেও যাদের গরুর গাড়ী ক্রয়ের সামর্থ্য ছিল না ; তারা আজকে একাধিক চ্যানেলের মালিক বনে গেছে জোট সরকারের বদান্যতায়। দলীয় বিবেচনায় নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে ডজন খানেক চ্যানেলের অনুমতি ইতোমধ্যেই দেয়া হয়েছে এবং আরও নাকি অনেক প্রক্রিয়াধীন আছে। বিরোধীদের এবং সৎ ও নিরপেক্ষতার দাবীদারদের এক্ষেত্রে দাবিয়ে রাখা হচ্ছে। দারিদ্র্য দূরীকরণে উপরোক্ত বিষয়গুলোর ভূমিকা অনস্বীকার্য হলেও কৌশল পত্র প্রণেতারা অন্যান্য অনেক কিছুর মত ওগুলোকেও এড়িয়ে গেছেন সুকৌশলে ; দিতে হবে, করতে হবে গোছের কিছু বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে। সর্বোপরি যেই দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্যে কৌশল পত্র সেই জনগোষ্ঠী এ সম্পর্কে আদৌ কিছু জানে না। আর তাই তো প্রতিদিনকার সংবাদপত্রে আমরা দেখতে পাই যে, দারিদ্র্য বিমোচনমূলক প্রকল্পসমূহের টাকা আত্মসাত করছে সরকার দলীয় ক্যাডাররা (১৫, ২২ ঃ ০৪ ঃ ০৬, ২৫ ঃ ০৪ ঃ ০৬ ও ২৯ ঃ ০৪ ঃ ০৬)। দেশের সর্বত্র, সর্বক্ষেত্রে চলছে হরিলুট (১৫, ০৮ ঃ ০১ ঃ ০৬, ২০ ঃ ০১ ঃ ০৬ ও ১১ ঃ ০৪ ঃ ০৬)। এমতাবস্থায়, আমরা মনে করি যে, তথাকথিত সহাস্রাব্দের লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রার নামে যা নির্ধারণ করা হয়েছে কৌশলপত্রে (সারণী – ১) তা আদৌ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। আর তার মানে দাঁড়াচ্ছে এই যে, আসলে এ কৌশল পত্র দারিদ্র্য নির্মূল বা হ্রাসের জন্যে নয় ; বরং দারিদ্র্য সংরক্ষণের জন্যেই করা হয়েছে। ইংরেজীতে আমরা এভাবে বলতে পারি ঃ It is not a Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP); but a Poverty Preservation Strategy Paper (PPSP).

পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা বনাম দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্র

আধুনিক পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার জন্ম হয় বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নে। আসলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পরিকল্পনার ধারনাটি সমাজতন্ত্রের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। পরিকল্পনা ছাড়া সমাজতন্ত্রের কথা চিন্তাই করা যায় না। অবশ্য সোভিয়েতদের পরিকল্পিত উন্নয়ন শুরু করতে একটু দেরী হয়। কারণ ১৯১৭ সালের ৭-ই নভেম্বর (রুশ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ২৫-শে অক্টোবর যেজন্যে একে মহান অক্টোবর বিপ্লব নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে) মহান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাত্র ছয় মাসের মাথায় ১৯১৮ সালের এপ্রিলে বৃটেন, জার্মানী, ফ্রান্স, মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র, তুরস্ক ও জাপানসহ এক ডজনের মত শক্তিশালী পুঁজিবাদী তথা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে এর তিন চতুর্থাংশ দখল করে নেয়। সদ্যজাত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটিকে তারা গলাটিপে হত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের সে আশা পূর্ণ হয় নি। মহামতি লেনিনের নেতৃত্বে মাত্র দেড় বছরের মাথায় ১৯২০ সালের ডিসেম্বর নাগাদ সোভিয়েতরা সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে তাদের মাতৃভূমিকে মুক্ত করতে সমর্থ হয়। দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার সাথে সাথেই সোভিয়েতরা গোত্রলরো নামে বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ঘোষণা করে, যার বাস্তবায়ন শুরু হয় ১৯২১ সাল থেকে। এ পরিকল্পনাটি ছিল দীর্ঘ মেয়াদী, অর্থাৎ দশ থেকে পনের-বিশ বছরের জন্যে। এ পরিকল্পনায় মূলতঃ গোটা সোভিয়েত ইউনিয়নের

বিদ্যুতায়নের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আর সেজন্যে লেনিন একে সমস্ত দেশের বিদ্যুতায়নের পরিকল্পনা নামে অভিহিত করেছিলেন। এর পাশাপাশি সোভিয়েতরা পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা (মধ্যমেয়াদী) রচনার কাজও এগিয়ে নেয়। কারণ গোত্রলরো পরিকল্পনা আসলে পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমেই বাস্তবায়ন করা হয়। ১৯২৮ সালের শেষদিকে তারা বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ঘোষণা করে, যার মেয়াদকাল ছিল ১৯২৮–২৯ থেকে ১৯৩২–৩৩ সাল পর্যন্ত। মাত্র সোয়া চার বছরে তারা এ পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা শুধু অর্জনই করে নি ; প্রায় সব ক্ষেত্রেই তাকে অতিক্রম করে যায় বহুগুণে। ফলে পরিকল্পনার মেয়াদের অনেক পূর্বেই তারা দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষক পরিকল্পনা ঘোষণা করে, যার মেয়াদকাল ছিল ১৯৩২-৩৩ থেকে ১৯৩৬-৩৭ সাল পর্যন্ত। এ দু'টি পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার অত্যন্ত সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়ন শুধু সমাজতন্ত্রের ভিত্তিই নির্মাণ করে নি, দেশে শিল্প বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছিল। ১৯৩৭ সাল নাগাদ সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বে একটি শক্তিশালী শিল্পায়ীত দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়। পুঁজিবাদী দেশগুলোতে যেখানে শিল্প বিপ্লব ঘটাতে তিনশো থেকে চারশো বছর সময় লেগেছিল (বিশ্বকে লুণ্ঠন করার পরও); সেখানে সোভিয়েত ইউনিয়ন মাত্র দু'দশকে (চরম প্রতিকূলতা সত্ত্বেও) শিল্প বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। আর পরিকল্পনার হিসেবে দেখলে মাত্র দু'টো পরিকল্পনায়ই, অর্থাৎ মাত্র দশ বছরেই সোভিয়েতরা অমন অসাধ্য সাধন করেছিল। আসলে প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমেই (মাত্র ৪.২৫ বছরে) তারা দেশ থেকে দারিদ্র্যকে চিরতরে নির্বাসনে পাঠিয়েছিল এবং মানুষের ছয়টি মৌলিক চাহিদা (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান) পূরণে সক্ষম হয়েছিল। শুধু তা-ই নয়, প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা শেষ হতে না হতেই অর্থনীতিতে শ্রমশক্তির ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছিল। যেকারণে দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় তারা শ্রম সাশ্রয়ী প্রযুক্তি উদ্ভাবনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল। গোত্রলরো পরিকল্পনায় সোভিয়েতরা ৩০টি বিদ্যুত কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিল, যার তিন চুতর্থাংশই নির্ধারিত ছিল প্রত্যন্ত এলাকাগুলোর জন্যে। কিন্তু বাস্তবে ১৯৩৭ সাল নাগাদ তারা ৪২টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করেছিল, যার বেশীরভাগই তখন উৎপাদনে ছিল। আসলে গোত্রলরো এবং প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনাগুলোই সোভিয়েত ইউনিয়নের পরবর্তী উন্নয়নের শক্ত ভিত তৈরী করে দিয়েছিল। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সোভিয়েতরা যখন সংকটবিহীনভাবে এরকম অভূতপূর্ব সাফাল্য অর্জন করেছিল, ঠিক তখন সমস্ত পুঁজিবাদী বিশ্ব মহাসংকটে (১৯২৯-১৯৩২ এর মহামন্দা) হাবুডুবু খাচ্ছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) কারণে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৩৭-৩৮-১৯৪১-৪২) বাস্তবায়ন করতে পারে নি। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর প্ররোচনায় হিটলারের জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সম্পাদিত অনাক্রমন চুক্তি লংঘন করে বিশ্বাসঘাতকের মত ১৯৪১ সালের ২২-শে জুন এক কোটি সৈন্য নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে। গোটা সোভিয়েত অর্থনীতি পুনরায় যুদ্ধ কালীন অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়। ১৯৪৫ সালের ৯-ই মে লাল বাহিনীর হাতে বার্লিনের পতনের মাধ্যমে ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। এ সময়ে কোনও পরিকল্পনা করা সম্ভব ছিল না। যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের অপূরণীয় ক্ষতি হয় ঃ প্রায় পঁচিশ মিলিয়ন সোভিয়েত নাগরিক প্রাণ হারায় এবং দেশটির তিন চতুর্থাংশ বস্তুগত সম্পদ ধ্বংস হয়েছিল, বিরান হয়ে গিয়েছিল কৃষি। যুদ্ধোত্তর সময়ে তারা চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা রচনা করে যার মেয়াদকাল ছিল ১৯৪৫-৪৬ থেকে ১৯৪৯-৫০ সাল পর্যন্ত। এ পরিকল্পনাটি ছিল মূলতঃ পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের পরিকল্পনা (৫, ৬)।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পূর্ব ইউরোপের পোল্যান্ড, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, পূর্ব জার্মানী ও চেকোশ্লোভাকিয়ায় সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয় এবং ১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারী কিউবায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে ফিডেল ক্যাস্ট্রো ক্ষমতায় আসেন। তবে এগুলোর চেয়েও বড় ঘটনা হলো এই যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর সময়ে অতি দ্রুত সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর উপনিবেশগুলোতে দাউ দাউ করে স্বাধীনতার আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। আর এক্ষেত্রে উপনিবেশগুলোর স্বাধীনতা সংগ্রামীরা স্বাভাবিকভাবেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন পায়। ফলশ্রুতিতে আমরা দেখতে পাই যে, মাত্র দু'দশকের ব্যবধানে পৃথিবীর মানচিত্রে একশোরও বেশী স্বাধীন রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে। সারা পৃথিবীব্যাপী বৃটেন, ফ্রান্স ও পর্তুগালসহ সকল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের উপনিবেশ হারায়। আর এ জন্যে তারা সমাজতন্ত্রের উপর ক্ষিপ্ত হয়। সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণের ক্ষেত্র সাংঘাতিকভাবে সংকুচিত হয়ে যাওয়ায় তারা নতুনভাবে চক্রান্ত শুরু করে নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত তাদের ভূতপূর্ব উপনিবেশগুলোকে সমাজতন্ত্র থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে। তারা নতুন রাষ্ট্রগুলোকে তাদের প্রয়োজনীয় সকল ধরনের কাঁচামালের উৎস ও তাদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার হিসেবে ব্যবহারের পদ্ধতি খুঁজতে শুরু করে। আর এভাবে তারা নব্য সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

অন্যদিকে বিগত শতাব্দীর বিশ ও ত্রিশের দশকের পুঁজিবাদের মহাসংকট এবং যুগযুগের ঐপনিবেশিক শাসন, লুণ্ঠন ও শোষণের ফলে নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলো সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পিত অর্থনীতিকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাফল্যে তারা সাংঘাতিকভাবে অনুপ্রাণিত হয়। প্রকৃতপক্ষে সারা বিশ্বব্যাপী তখন পরিকল্পিত অর্থনীতির ধারণাটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশই পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনাকে তাদের উন্নয়নের প্রধান দর্শন হিসেবে বেছে নেয়। তবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের অগ্রযাত্রাকে নানাভাবে বাধা দিতে থাকে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা সফলকাম হয়। এ ক্ষেত্রে তারা বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, কমনওয়েলথসহ তাদের গঠিত বিভিন্ন সংস্থাকে ব্যবহার করে। এমন কি যেসকল দেশ তাদের কথামত চলতে রাজি হয় নি, সেখানে তারা বল প্রয়োগ পর্যন্ত করেছে। ইন্দোনেশিয়ার ড. সুকর্ণোর সরকার, চিলির ড. আলেন্দের সরকার ও বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধুর সরকারসহ বহু দেশের সরকারকে তারা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে উৎখাত করেছে অত্যন্ত নৃশংসভাবে। অথচ চীন, ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া, কিউবা, ভারত ও মালয়েশিয়ার মত দেশগুলো সাম্রাজ্যবাদীদের রুখে দাঁড়াতে পেরেছে বিধায় তারা পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধনে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশও স্বাধীনতা উত্তর সময়ে তার আর্থসামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্যে পরিকল্পিত উন্নয়নকে প্রধান অর্থনৈতিক দর্শন হিসেবে গ্রহণ করে। ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের আশা-আকাংখাকে ধারণ করে ১৯৭২ সালেই রচিত হয়েছিল বাংলাদেশের সংবিধান যা ঐ বছরের ৪-ঠা নভেম্বর সংসদে পাশ হয়েছিল। এ সংবিধানে বাংলাদেশের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল চারটি ঃ বাঙালী জাতীয়তাবাদ, ধর্ম নিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র। আর এ চারটি লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপ দেয়ার উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছিল বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮) যার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ ছিল নিম্নরূপ (১০)ঃ

১। *দারিদ্র্য হ্রাস করা ;*

২। *পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন ১৯৬৯-৭০ সালের পর্যায়ে উন্নীত করা ;*

৩। *মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ৫.৫% হারে বৃদ্ধি করা, ৪১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং ছদ্ম বেকারত্ব হ্রাস করা ;*

৪। *ভোগ্য পণ্যের (খাদ্য, বস্ত্র, ভোজ্য তেল, কেরোশিন ও চিনি) উৎপাদন বৃদ্ধি করা ;*

৫। *মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা ;*

৬। *মাথাপিছু আয় ২.৫% হারে বৃদ্ধি করা (দরিদ্রদের আয় বৃদ্ধি ও ধনীদের আয় স্থির রাখার মাধ্যমে);*

৭। *সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের জন্যে ইতোমধ্যে অর্জিত সাফল্যসমূহকে আরও শক্তিশালী ও মজবুত করা ;*

৮। *স্বয়ম্ভরতা অর্জনের মাধ্যমে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা হ্রাস করা (আমদানী বিকল্প শিল্পায়ন ঃ মাধ্যমিক পণ্য, সার, সিমেন্ট, ইস্পাত ইত্যাদি শিল্প গড়ে তোলার মাধ্যমে) ;*

৯। *খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্যে কৃষির প্রযুক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর ঘটানো ;*

১০। *জনসংখ্যা পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রনের এক উচ্চাকাংখী কর্মসূচীর ভিত্তিমূলক কাজে হাত দেয়া ;*

১১। *উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধি করা এবং সামাজিক ও মানব সম্পদ উন্নয়নের মত খাতগুলোকে (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামীণ আবাসন ও পানি সরবরাহ ইত্যাদি) গুরুত্ব দেয়া ;*

১২। *সারা দেশব্যাপী সুষমভাবে আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা।*

বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার উপরোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অত্যন্ত মহৎ ও সুদূরপ্রসারী ছিল এবং ওগুলো বাস্তবায়িত হলে প্রকৃতপক্ষেই আমাদের দেশ একটি স্বয়ম্ভর ও মর্যাদাশীল দেশে পরিণত হতো বলে আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু একাত্তরের পরাজিত শক্তি এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াশীল অশুভ শক্তির নানামুখী অপতৎপড়তার কারণে এ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া মাঝপথে বাঁধাগ্রস্থ হয়। যেসকল কারণে এ পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জিত হতে পারে নি সেগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

১। *মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের অপুরনীয় ক্ষয়ক্ষতি (৩০ লক্ষ মানুষের আত্মাহুতি, রাস্তাঘাট, সেতু, কালভার্ট, রেল লাইন, নগর, বন্দর ইত্যাদি প্রায় ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয় এবং কৃষি, শিল্প ও অবকাঠামোর মত খাতগুলো বিরান হয়ে যায়) ;*

২। *যাওয়ার (পরাজিত হওয়ার) মূহুর্তে পাকিস্তানীদের আখেরী লুণ্ঠন (আমাদের উড়োজাহাজ, সমুদ্রগামী জাহাজ–ট্যাংকার, বোট, গানবোট ইত্যাদি ; বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সকল ব্যাংকে রক্ষিত টাকা–পয়সা, সোনা–দানা সবকিছুই তারা নিয়ে যায়) ;*

৩। *স্বাধীনতার শত্রুদের ধ্বংসাত্মক তৎপড়তা (শিল্প কলকারখানায় আগুন দেয়া, নানাভাবে উৎপাদন কর্মকান্ডে বাঁধা দেয়া, চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি) ;*

৪। *আন্তর্জাতিকভাবে সাম্রাজ্যবাদী–পুঁজিবাদী দেশসমূহের অসহযোগিতা (শর্তযুক্ত সাহায্যের প্রস্তাব যা বঙ্গবন্ধুর সরকার প্রত্যাখ্যান করেন, ঋণ ও খাদ্য সাহায্য দিতে গড়িমশী করা (১৯৭৪), দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীল ও স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিগুলোকে মদদ দান ইত্যাদি) ;*

৫। *১৯৭৪ সালের ভয়াবহ বন্যা (বন্যার ফলে কৃষি উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়) ;*

৬। *জ্বালানী তেলের মূল্য বৃদ্ধি (১৯৭৩ সালের ইসরাইল–মিশর–সিরিয়ার যুদ্ধের ফলে তেলের মূল্য*

বৃদ্ধি পেতে শুরু করে ঃ ১৯৭৩ সালের ব্যারেল প্রতি এক ডলারের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭৫ সালে পনের ডলার এবং ১৯৭৮ নাগাদ প্রায় কুড়ি ডলারে উঠে যায়) ;

৭। *১৯৭৫ সালের ১৫-ই আগষ্ট বঙ্গ বন্ধুকে সপরিবারে হত্যা (শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা ব্যতীত অন্য সকলকে হত্যা করা হয় ; প্রতিষ্ঠা করা হয় সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী ক্রীড়নক সরকার ; অবশ্য প্রকৃত ক্ষমতা সেনাবাহিনীর হাতেই থেকে যায় এবং পরবর্তীতে জেনারেল জিয়ার ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে যা চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে) ;*

৮। *লক্ষ্যের পরিবর্তন (সামরিক শাসক জিয়া এক কলমের খোঁচায় সংবিধানের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য কেটে ধর্মনিরপেক্ষতার বদলে বিসমিল-াহ এর প্রবর্তন করলেন এবং সমাজতন্ত্রের বদলে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিস্থাপন করলেন)।*

সামরিক একনায়ক জেনারেল জিয়া সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করেছেন দেশের পরিকল্পনা ব্যবস্থার। বঙ্গবন্ধুর সরকার স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে একটি মর্যাদাসম্পন্ন স্বাধীন পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেছিলেন এবং সেখানে দেশের শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ অর্থনীতিবিদদের স্থান করে দিয়েছিলেন। প্রফেসর নূরুল ইসলাম (ডেপুটি চেয়ারম্যান), প্রফেসর মুশাররফ হোসেন (সদস্য), প্রফেসর মোজাফফর আহমদ (সদস্য) ও প্রফেসর রেহমান সোবহান (সদস্য) এর মত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পনা কমিশনে কাজ করেছেন এবং দেশের প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। অথচ সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের কুপরামর্শে জেনারেল জিয়া পরিকল্পনা কমিশনের মর্যাদা ক্ষুন্ন করে সেখানে আমলাদের রাজত্ব কায়েম করেন। মন্ত্রণালয়ের পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয় পরিকল্পনা কমিশনকে। বিশেষজ্ঞরা বিশেষ করে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদরা বিতারিত হন সেখান থেকে। পরিকল্পনা কমিশন পরিণত হয় একটি অধঃস্তন মামুলি প্রতিষ্ঠানে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের পরবর্তী সকল পরিকল্পনাই মূলতঃ আমলাদের স্বার্থে এবং আমলাদের দ্বারা রচিত হয়েছে। অথচ প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল দেশের জন্যে, দেশের জনগণের জন্যে এবং দেশের শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞদের দ্বারা। পরবর্তী পরিকল্পনাগুলোর ক্ষেত্রে আমরা অমনটা দেখতে পাই নি। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ; যেখানে বিশেষজ্ঞদের কাজে লাগানোর একটা প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হলেও আমলাদের খবরদারীমুক্ত করা যায় নি পরিকল্পনা ব্যবস্থাকে। আসলে পঁচাত্তর পরবর্তী সরকারগুলো বিশেষ করে সামরিক, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির সরকারগুলো বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফের মত সাম্রাজ্যবাদী সংস্থাগুলোর কুপরামর্শে এদেশ থেকে পরিকল্পনার নাম-গন্ধ মুছে ফেলার প্রকল্প হাতে নেয়। আর সেজন্যেই আমরা দখেতে পাই যে, ১৯৯১–৯৬ সময়ে বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল তখন ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশের চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হলেও তৎকালীন সরকার পরবর্তী পরিকল্পনা, অর্থাৎ পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা রচনা করে নি। ফলে ১৯৯৬–৯৭ সময়টা বাংলাদেশ পরিকল্পনাহীন অবস্থায় চলেছে। ১৯৯৬ এর নির্বাচনে শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতায় এসে ১৯৯৭-২০০২ সময়ের জন্যে পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা রচনা করে। ২০০২ সালে এ পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হলেও বিএনপি-জামাতী সরকার পরবর্তী, অর্থাৎ ষষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা রচনা করে নি। তারা আবার সাম্রাজ্যবাদীদের নীলনকসা অনুযায়ী ঘূর্ণায়মান (rolling) পরিকল্পনা, অংশীদারিত্বের পরিকল্পনা এবং সবশেষে পিআরএসপি ইত্যাদি বিভিন্ন চটকদারী ও অদ্ভূত সব কর্মসূচী রচনা করে চলেছে। দেশের অর্থনীতিতে বর্তমানে বিদ্যমান চরম নৈরাজ্যজনক অবস্থার জন্যে আমরা মনে করি পরিকল্পনাহীনতাই অনেকাংশে দ্বায়ী। আসলে অর্থনীতির জন্যে গুরুত্বপূর্ণ কোন প্রকল্পের পরিকল্পনা থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত

কম পক্ষে একটা মধ্য মেয়াদের সময়ের, অর্থাৎ পাঁচ বছরের সময়ের প্রয়োজন হয় (যেমন একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মান, একটি সেতু নির্মান ইত্যাদি)। আর জাতির সম্মুখে কতগুলো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রা থাকলেই কেবল তা অর্জনের জন্যে প্রচেষ্টা নেয়া সম্ভব হয়। একমাত্র পঞ্চ বর্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমেই তা সম্ভব বলে আমরা মনে করি। সেকারণেই চীন, ভারত ও মালয়েশিয়ার মত দেশগুলো তাদের অর্থনীতিতে পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার ধারা বজায় রেখেছে এবং যা কিছু সংস্কার প্রয়োজন তা তারা পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায়ই করেছে। ভারত তো সরাসরি পিআরএসপি করার ধারণা প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছে।

বর্তমানে বিএনপি-জামাতী জাতীয়তাবাদী সরকারের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, উপদেষ্টা, নেতা, উপ-নেতা, পাতিনেতা সবারই এক কথা বাংলাদেশ তাদের আমলে উন্নয়নের জোয়ারে ভাসছে। কিন্তু দেশের মানুষ দেখছেন ঃ সর্বত্রই উন্নয়নে ভাটা; সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী, টেন্ডারবাজী, ক্রস ফায়ার ও এনকাউন্টারে হত্যা, ক্লীনহার্ট অপারেশনে হত্যা, খুন-খারাবি, রাহাজানি, দখল, জবর-দখল, দুর্নীতি ও দুঃশাসনে দেশ ডুবছে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর সমস্যা তো মানুষকে পাগল করে দিয়েছে। এ সবে জর্জড়িত মানুষ এখন বিদ্রোহী হয়ে উঠছে ঃ কানশাট ও শনির আখড়ার ঘটনা এরই সর্বশেষ উদাহরণ। দেশের তথা জনগণের সমস্যা নিয়ে সরকারের কোনও মাথাব্যাথা নেই। সংসদে এগুলো নিয়ে সরকার নিজেও আলোচনা করে না, বিরোধী দলগুলোকেও আলোচনা করতে দেয় না। আর জাতীয়তাবাদী সরকারের অর্থমন্ত্রী তো তথ্য ইঞ্জিনিয়ারিং এ ওস্তাদ। পরিসংখ্যান ব্যুরোকে তিনি তার কাছে নিয়ে নিয়েছেন এবং ইচ্ছে মত তথ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করছেন। শেখ হাসিনার আমলের তথ্যকে কমিয়ে দেখাচ্ছেন এবং তাদের (বিএনপি–জামাতী সরকারের) তথ্য বাড়িয়ে দেখাচ্ছেন। দেশের এবং বিদেশের জাতীয়তাবাদী হোক আর বিজাতীয়তাবাদীই হোক কেহই বর্তমান সরকারের তথ্যে বিশ্বাস করছে না। এমন কি বিশ্ব ব্যাংক, এডিবির মত সংস্থার হিসেবের সাথে বর্তমান অর্থমন্ত্রীর প্রবৃদ্ধির হিসেব মিলছে না। এত কিছুর পরেও দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমান ও অতীতের বিএনপি সরকারগুলোর প্রবৃদ্ধির চিত্র আওয়ামী লীগ সরকারগুলোর প্রবৃদ্ধির চিত্রের তুলনায় অনেকটাই মলিন। সামরিক ও এরশাদ সরকারের প্রবৃদ্ধির চিত্র আরই খারাপ (সারণী – ৯)। সারণী–৯ এ উপস্থাপিত তথ্য বলছে যে, চরম প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় অর্জিত প্রবৃদ্ধির হার বেশ সন্তোজনক ছিল–৪.০০%। অন্যদিকে পরবর্তি তিনটি পরিকল্পানয়–একটি দু'বছর মেয়াদী ও দু'টি

সারণী ৯ : বাংলাদেশের পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনাসমূহে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনের চিত্র, ১৯৭৩ – ২০০২ সময়ে

পরিকল্পনাসমূহ	প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা, %	অর্জন, %
১	২	৩
১। প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ঃ ১৯৭৩ – ১৯৭৮	৫.৫০	৪.০০
২। দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা ঃ ১৯৭৮ – ১৯৮০	৫.৬০	৩.৫০
৩। দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ঃ ১৯৮০ – ১৯৮৫	৫.৪০	৩.৮০
৪। তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ঃ ১৯৮৫ – ১৯৯০	৫.৪০	৩.৮০
৫। চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ঃ ১৯৯০ – ১৯৯৫	৫.০০	৪.১৫
৬। পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ঃ ১৯৯৭ – ২০০২	৭.০০	৫.২১

উৎসঃ ১, পৃঃ ২৪৩ এর ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত।

পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় প্রবৃদ্ধি ছিল অত্যন্ত অসন্তোষজনক ঃ ৪.০০% এর নীচে, যথাক্রমে ৩.৫০%, ৩.৮০% ও ৩.৮০% । চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় এসে প্রবৃদ্ধির হার প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার পর্যায়ে উন্নীত হলেও সন্তোষজনক বলা যায় না কোনও বিবেচনায় (বিএনপি ক্ষমতায় ছিল তখন) । পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় এসে দেখা যাচ্ছে যে, প্রবৃদ্ধির হার জাতীয়তাবাদী হিসেবেও পূর্ববর্তী সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে, অর্থাৎ প্রবৃদ্ধি ৫.২১% এ উন্নীত হয় (আওয়ামী লীগ সরকারের হিসেবে ৬.০% এর বেশী) ।

সারণী ১০ : সাম্প্রতিককালের বাংলাদেশের তিনটি সরকারের আমলে সরকারী বিনিয়োগের চিত্র, ১৯৯১ – ২০০২ সময়ে

সরকারী বিনিয়োগ	সরকার		
	খালেদা	হাসিনা	খালেদা – নিজামী
	১৯৯১ – ১৯৯৬	১৯৯৬ – ২০০১	২০০১ – ২০০৫
১ ২	৩	৪	
মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অংশ, %	৬.৬৪	৬.৯৪	৬.১৮

উৎসঃ ২, পৃঃ ২২২ এর ভিত্তিতে হিসেবকৃত ।

সারণী ১১ : বাংলাদেশের সাম্প্রতিককালের তিনটি সরকারের গড় প্রকল্প সাহায্য ব্যয়ের চিত্র, ১৯৯১ – ২০০৫ সময়ে

প্রকল্প সাহায্য	সরকার		
	খালেদা	হাসিনা	খালেদা – নিজামী
	১৯৯১ – ১৯৯৬	১৯৯৬ – ২০০১	২০০১ – ২০০৫
১	২	৩	৪
মোট ব্যয়ের অংশ, %	৮৯.৪	৯১.২	৭৮.৪

উৎসঃ ২, পৃঃ ২৩৫ এর ভিত্তিতে হিসেবকৃত ।

২০০৩ সাল থেকে সরকার পিআরএসপি বাস্তবায়ন শুরু করে (২০০২ সালে পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হয়) । ২০০৫ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত সরকারী তথ্যেই দেখা যাচ্ছে যে, সরকারী বিনিয়োগ, প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহের প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বর্তমান জোট সরকার পূর্ববর্তী হাসিনা সরকারের অনুরূপ তথ্য থেকে অনেকটাই পিছিয়ে আছে (সারণী – ১০, সারণী – ১১ ও সারণী – ১২) । সারণী – ১০ এর তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, খালেদা–নিজামী জোট সরকারের আমলে ২০০১–২০০৫ সময়ে গড়ে সরকারী বিনিয়োগের অংশ ছিল মাত্র ৬.১৮% (মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অংশ হিসেবে) যা খালেদা জিয়ার পূর্ববর্তী শাসনামলের (১৯৯১–১৯৯৬) চেয়েও কম (৬.৬৪%) । আর শেখ হাসিনার আমলে (১৯৯৬–২০০১) অনুরূপ অংকটি ছিল ৬.৯৪% (প্রায় ৭.০%) । প্রকল্প বাস্তবায়নেও জোট সরকার চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে । ২০০১–২০০৫ (জোট

সারণী ১২ : বাংলাদেশের সাম্প্রতিককালের তিনটি সরকারের আমলে অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের গড় প্রবৃদ্ধির চিত্র, ১৯৯১ – ২০০৫ সময়ে %

খাতসমূহ	সরকার		
	খালেদা	হাসিনা	খালেদা – নিজামী
	১৯৯১ – ১৯৯৬	১৯৯৬ – ২০০১	২০০১ – ২০০৫
১	২	৩	৪
১। কৃষি	০.৪৪	৪.৫৮	১.৬৭
২। মৎস্য	৭.৭৬	৬.১৮	২.৯২
৩। শিল্প	৮.২১	৫.৬৪	৬.৯৪
৪। খুচরা ব্যবসা	৫.৩৪	৬.৩৪	৬.৫২
৫। যোগাযোগ	৪.১০	৬.২১	৬.২৬
৬। নির্মাণ	৭.৮৫	৮.০৩	৮.৪১
মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন	৪.৬৪	৫.৩৪	৫.০৮

উৎসঃ ২, পৃঃ ২২৫ এর ভিত্তিতে হিসেবকৃত।

সরকারের আমলে) সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের গড় হার ছিল ৭৮.৪%, ১৯৯১–১৯৯৬ (খালেদার আমলে) ছিল ৮৯.৪%, আর ১৯৯৬–২০০১ (শেখ হাসিনার আমলে) সময়ে ছিল ৯১.২%। ২০০৫–২০০৬ অর্থ বছরে প্রকল্প বাস্তবায়নের হার আরও হ্রাস পেয়েছে (৭০.০% এরও কম)। অপরদিকে সারণী – ১২ এর তথ্য থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, অন্যান্য খাতগুলোর গড় প্রবৃদ্ধি হাসিনা আমলের কাছাকাছি থাকলেও কৃষি ও মৎস্য খাতের প্রবৃদ্ধি সাংঘাতিকভাবে হ্রাস পেয়েছে। খালেদা–নিজামী আমলে কৃষির গড় প্রবৃদ্ধি মাত্র ১.৬৭% এ এসে ঠেকেছে, যা হাসিনার আমলে প্রায় তিন গুণ বেশী ছিল (৪.৫৮%)। অবশ্য খালেদার পূর্ববর্তী আমলে (১৯৯১–১৯৯৬) তা আরও কম ছিল মাত্র ০.৪৪%। মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে খালেদা ও হাসিনার আমলের গড় প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ২.৯২% ও ৬.১৮%। ২০০৫–২০০৬ এ এসে অবস্থার যে আরও অবনতি হয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বর্তমান জোট সরকারের চরম দুঃশাসনে দেশ আজ ধ্বংসের শেষ প্রান্তে এসে পৌছেছে। সংকট নেই এমন কোনও ক্ষেত্র আজ আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা মনে করি সরকার সাম্রাজ্যবাদী দেশ ও সংস্থাগুলোর কুপরামর্শ মোতাবেক পরিকল্পনাহীন অবস্থায় চলতে গিয়েই এরকম একটা লেজে-গোবরে অবস্থার জন্ম দিয়েছে যা আমাদের দেশের প্রাপ্য ছিল না। অতএব, আমরা বিশ্বাস করি যে, পি.আর.এস.পি কখনই পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার বিকল্প হতে পারে না। টেকসইভাবে দারিদ্র্য নির্মূল করতে হলে পরিকল্পনার কাছেই যেতে হবে।

সুপারিশমালা

তথাকথিত প্রবৃদ্ধি এবং তার উচ্ছিষ্ট বিতরণ নয়, আমরা চাই টেকসইভাবে দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান। আর তা করতে হলে আমাদের মতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী ঃ

১. পিআরএসপি নয়, পরিকল্পনায় ফিরে যেতে হবে ঃ পঞ্চ বার্ষিক ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনায়। মনে রাখতে হবে দারিদ্র্য একটি বহু মাত্রিক জটিল সমস্যা ঃ এর সাথে জনসংখ্যাতাত্ত্বিক (demographic), অর্থনৈতিক (economic), সামাজিক (social), সাংস্কৃতিক (cultural) ইত্যাদি উপাদানের সরাসরি সম্পর্ক বিদ্যমান। কাজেই সমস্যার মূলে হাত দিতে হবে। আর সেজন্যে প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী (১০ – ২০ – ৫০ – ১০০ বছর), মধ্যমেয়াদী (৫ – ১০ বছর) ও স্বল্প মেয়াদী (১ – ৫ বছর) সুসমন্বিত পরিকল্পনার যার থাকবে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য – দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

২. সম্পদে দরিদ্রদের অধিকার দিতে হবে। ভূমি ও জলাশয়সহ যাবতীয় জাতীয় সম্পদে দরিদ্রদের তথা জনগণের মালিকানা কায়েম করা ব্যতীত বাংলাদেশের দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় বলে আমরা মনে করি। জরুরী ভিত্তিতে এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে সরকারী খাশ জমি দরিদ্রদের মধ্যে বন্টনের কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে রক্ষক ভক্ষক হলে চলবে না। দেখা যাচ্ছে যে, কিছু কিছু খাশ জমি বন্টন করা হলেও প্রকৃত দরিদ্ররা তা পায় নি, অথবা পেলেও পরবর্তীতে প্রভাবশালীরা তা জবরদখল করে নিয়েছে। সুতরাং দরিদ্ররা যাতে বন্টনকৃত জমির দখল পায় ও তা ব্যবহার করতে পারে তার নিশ্চয়তা সরকারকেই দিতে হবে। জলমহল (নদী, বিল, হাওর-বাওর, সাগর ইত্যাদি) ও বনাঞ্চলের ক্ষেত্রেও দরিদ্রদের অধিকারকে অগ্রাধিকার দেয়া আবশ্যক। বর্তমানে প্রভাবশালীরাই এগুলো ভোগ করছে নিজের নাম করে এবং সরকার বঞ্চিত হচ্ছে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব থেকে। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে ঃ খাশ জমি, জলমহল ও বনাঞ্চলের ক্ষেত্রে সমবায় পদ্ধতি প্রয়োগ করে দরিদ্রদের সংগঠিত করা যেতে পারে এবং সরকার সর্বোতভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা দিলে এভাবে ওগুলোর অর্থনৈতিক ব্যবহার যেমন নিশ্চিত হবে, ঠিক তেমনিভাবে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থান ও জীবন-জীবিকার সংস্থান সম্ভব হবে।

৩. দরিদ্রদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। শেখ হাসিনার সরকারের আমলে স্থানীয় সরকারের কাঠামো (চার স্তর বিশিষ্ট) সংক্রান্ত যে আইন পাশ হয়েছিল তার আলোকে নিয়মিত নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমানে এ আইনের আংশিক বাস্তবায়ন আমরা দেখতে পাচ্ছি (উপজেলা নির্বাচন আদৌ হয়নি)। উপরন্তু গ্রাম সরকারের মত এক দানবীয় (অনির্বাচিত) দলীয় ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে আমাদের সুন্দর গ্রামগুলোর উপর। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, হাইকোর্ট এ ব্যবস্থাকে অবৈধ ঘোষণা করে রায় দিয়েছে; অথচ সরকার সুপ্রিম কোর্টে আপিলের নামে একে ঝুলিয়ে রেখেছে অদ্যাবধি। আমাদের কথা হচ্ছে ঃ ছল-চাতুরী করে লাভ নেই; দরিদ্রদের ক্ষমতায়ন ব্যতীত দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়া অসম্ভব। অতএব, স্থানীয় সরকারের সর্ব স্তরে দরিদ্রদের প্রতিনিধিত্ব ও অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

৪. দেশের বাজেট ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। বাজেট হতে হবে দরিদ্রবান্ধব। পিআরএসপি করা হয়েছে; অথচ বাজেট করা হচ্ছে বিত্তবান ও শাসক গোষ্ঠির স্বার্থে। সরকারের রাজস্ব আয়ের

৮০% এরও বেশী আসছে পরোক্ষ কর থেকে যার বোঝাটা শেষ পর্যন্ত দরিদ্রদেরকেই বহন করতে হচ্ছে। আয়কর ও কর্পোরেট কর থেকে সরকার মাত্র ১৫% এর মত আয় করছে। অন্যদিকে ব্যবসায়ী – শিল্পোদ্যোক্তাদের সরকার কর অবকাশ সুবিধাসহ হাজার হাজার কোটি টাকার নগদ সুবিধা দিয়ে আসছে। বিষয়টি এমন পর্যায়ে গেছে যে, ব্যবসায়ীরা এখন বিদ্যমান ৫% এর স্থলে ১৫% নগদ সহায়তা চাচ্ছে। সবচেয়ে আতঙ্কের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, বিএনপি–জামাত জোট সরকারের বিগত পৌনে পাঁচ বছরের শাসনামলে চাঁদাবাজি ও সিন্ডিকেট ব্যবসা এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে, দেশবাসী আজ তাদের কাছে প্রকৃতপক্ষেই জিম্মি হয়ে পড়েছে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডঃ আবুল বারকাত তার এক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, বিগত সাড়ে চার বছরে সিন্ডিকেট চক্র বাজার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ২ লাখ ৮৬ হাজার ১১০ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে (১৫, ২০ ঃ ০৬ ঃ ০৬)। তাছাড়া সরকারী খাশ জমি, বনাঞ্চল, জলাশয় ও রেলের জমিসহ সরকারী সকল প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি মন্ত্রী, এমপিসহ সরকারী দলগুলোর গুন্ডা-মাস্তানরা দখল, জবর-দখল করছে, ভোগ করছে। অথচ সরকারের বাজেটে এ সম্পর্কে কোনও বক্তব্য পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে কি দাঁড়াল? সরকার বাজেটের মাধ্যমে দরিদ্রদের কাছ থেকে টাকা (কর আকারে) নিয়ে ধনীদের মধ্যে বিভিন্ন সুবিধা দেয়ার নামে বন্টন করে দিচ্ছে। আর কৃত্রিমভাবে (চাঁদাবাজি ও সিন্ডিকেট ব্যবসার মাধ্যমে) জিনিষ পত্রের দাম বাড়িয়ে দরিদ্র মানুষের সর্বস্ব লুটে নিচ্ছে। তাছাড়া সরকারী সম্পত্তি (যা আসলে গরীবের হক) লুন্ঠনের মাধ্যমে সরকারদলীয়রা দরিদ্র মানুষের হক নষ্ট করছে, তাদেরকে বঞ্চিত করছে। বাজেট ব্যবস্থার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে দুর্নীতির ব্যাপারে নিরবতা পালন। কোন কোন বাজেটে দুর্নীতির স্বীকৃতি থাকলেও অর্থমন্ত্রীকে এরকম বলতে শোনা গেছে যে, "উন্নত দেশেও দুর্নীতি হয় ; অতএব আমাদের দেশেও হবে, তাতে দোষের বা আশ্চর্যের কিছু নেই"। আর দুর্নীতি দমন কমিশনের নামে যে ধ্বজভঙ্গ কমিশন গঠন করা হয়েছে তাকে দুর্নীতি দমনের নামে বাহাস বললেও কম বলা হবে বলে আমরা মনে করি। সুতরাং আমাদের কথা হচ্ছে এই যে, বাজেটের এ গরীব-বিদ্বেষী দিকগুলোকে উল্টোদিকে ঢেলে সাজাতে হবে। ভারত ও চীন পারলে আমরা পারবো না কেন? ধনীরা কর দেবে, দরিদ্ররা পাবে, দুর্নীতি ও চাঁদাবাজি থাকবে না। এ বিষয়গুলো সরকারকেই নিশ্চিত করতে হবে। তা না হলে দারিদ্র্য উচ্ছেদ শুধুই ফাঁকা বুলি হয়ে থেকে যাবে।

৫. দরিদ্রবান্ধব অর্থনৈতিক অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। কে না জানে যে, রেল ও নৌ পরিবহণ হচ্ছে সবচেয়ে দরিদ্রবান্ধব পরিবহণ ব্যবস্থা। অথচ আমাদের দেশে এ দু'টি পথই সবচেয়ে অবহেলিত রয়ে গেছে। স্বাধীনতার পয়ত্রিশ বছরে প্রায় ৯ হাজার কিলোমিটার নৌ পথ এখন প্রায় ৩ হাজার কিলোমিটারে এসে ঠেকেছে; আর প্রায় ২,৮০০ কিলোমিটার রেল পথ মাত্র ২,৬০০ (প্রায়) কিলোমিটারে এসে দাঁড়িয়েছে (১৩)। পক্ষান্তরে প্রায় আড়াই লক্ষ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। এতে দেশের অতি মূল্যবান হাজার হাজার হেক্টর আবাদী জমি নষ্ট হয়েছে এবং অসংখ্য দরিদ্র মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে (তাদের জমিও গেছে এবং জমির মূল্যও তারা পায়নি)। তদুপরি মানসম্পন্ন রাস্তা না হওয়ায় প্রতিবছর মেরামতির নামে হাজার হাজার কোটি টাকা অপচয় হচ্ছে। আর সড়ক পথে মানুষের উপকারের যে ফিরিস্তি দেয়া হচ্ছে তার চেয়ে রেল ও নৌ পথের বিকাশ ঘটালে হাজার গুণে বেশী উপকৃত হতো এদেশের দরিদ্র মানুষরা। কারণ

এ দু'টো পথেই অনেক কম খরচে মানুষ যাতায়াত ও পণ্য পরিবহণ করতে পারতো। অতএব, দারিদ্র্য উচ্ছেদ করতে হলে এ দু'টো পথের দিকে জরুরী ভিত্তিতে বিশেষ নজর দিতে হবে।

৬. মানব দারিদ্র্য দূরীকরণে শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। স্বাধীনতার ৩৫ বছর পরেও দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ অক্ষরজ্ঞানহীন। এত বিপুল সংখ্যক মূর্খ মানুষ নিয়ে দারিদ্র্য উচ্ছেদের চিন্তা করা অনেকটা উজানে নৌকা চালানোর মতই মনে হয়। আর শিক্ষার নামে আমাদের দেশে চলছে আসলে ব্যবসা। দেশপ্রেম ও বাস্তবতা বিবর্জিত চলমান শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের মানুষকে করছে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে ঃ শিক্ষা খাতকে এ অবস্থা থেকে অবশ্যই মুক্ত করতে হবে ; এখাতের বরাদ্দ বর্তমানের কয়েক গুণ বাড়াতে হবে ; বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে হবে ; স্বল্প সময়ের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করার এক ক্রাশ প্রোগ্রাম গ্রহণ করতে হবে ; শিক্ষকদের জন্যে আলাদা ও উচ্চতর বেতন কাঠামোর প্রবর্তন করতে হবে এবং সাথে সাথে টিউশনি ও নোট ব্যবসা নিষিদ্ধ করতে হবে ; পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত পারলে আমরা পারবো না কেন? মনে রাখতে হবে শিক্ষক সমাজকে অভূক্ত রেখে আর যা-ই হোক সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাও হবে না, শিক্ষায় লিঙ্গ বৈষম্যও দূর করা যাবে না। মানসম্পন্ন শিক্ষা তো কল্পনাই থেকে যাবে।

৭. মানব দারিদ্র্য উচ্ছেদে স্বাস্থ্য সেবার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকার যদিও বলে বেড়াচ্ছে যে, বাংলাদেশের প্রায় একশো ভাগ মানুষ নিরাপদ পানীয় জল পাচ্ছে, সংবাদ মাধ্যমে আমরা প্রতিদিন দেখতে পাচ্ছি যে, খোদ রাজধানী ঢাকার অধিকাংশ মানুষ পানি পাচ্ছে না, কিংবা পেলেও তা অত্যন্ত দূঃষিত। আর একথা তো সবার জানা যে, আমাদের দেশের প্রায় তিন চতুথাংশ এলাকার ভূগর্ভস্থ পানি আর্সেনিক দূষণে দূঃষিত। জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ উপদেষ্টা প্রফেসর জেফ্রী সেক্সের মতে, বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ বিষাক্ত আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করছে (১১, পৃঃ ১৯)। আমাদের দেশে স্বাস্থ্য খাতে মাথাপিছু বাৎসরিক ব্যয় পাঁচ ডলারেরও কম। এর সাথে যদি চুরি, আত্মসাৎ ও দুর্নীতির ব্যাপারটি যুক্ত করা যায় তাহলে সহজেই বোধগম্য যে, দরিদ্র মানুষরা আসলেই স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিতই থাকছে। ক্লিনিক আছে, তো ডাক্তার নেই। এরকম অবস্থায় গরীব মানুষ চিকিৎসা পাবে কিভাবে? আমরা মনে করি এ খাতে বরাদ্দ যেমন বাড়াতে হবে, ঠিক তেমনিভাবে বরাদ্দকৃত অর্থ যেন যথাযথভাবে ব্যয় হয় এবং দরিদ্র মানুষ সেবা পায় তার নিশ্চয়তা সরকারকেই বিধান করতে হবে।

৮. দারিদ্র্য দূরীকরণে বিদ্যুতের ভূমিকা অপরিসীম। অথচ এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। আমাদের দেশের প্রায় ৭০% মানুষ এখনও বিদ্যুৎ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। প্রফেসর জেফ্রী সেক্সের মতে, যেদেশের বেশীর ভাগ মানুষ এখনও জ্বালানীর জন্যে গোবর ও কাঠের উপর নির্ভরশীল, সেদেশে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের আশা অত্যন্ত ক্ষীণ (১১, পৃঃ ১৯)। বিদ্যুৎ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠী। অথচ এক্ষেত্রে বর্তমান বিএনপি-জামাত জোট সরকারের ব্যর্থতা গগণচুম্বী। শেখ হাসিনার সরকারের আমলে যেখানে ৪০০০ মেগাওয়াটের মত বিদ্যুৎ উৎপাদিত হতো, এখন সেখানে উৎপাদন হচ্ছে মাত্র ৩,০০০ মেগাওয়াটের মত। অথচ দেশের চাহিদা ৫০০০ মেগাওয়াট ছাড়িয়ে গেছে। বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে যে, বিগত পৌনে পাঁচ বছরেও সরকার নতুন কোনও বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে নি। দেখা যাচ্ছে যে, জোট সরকার তাদের অতীত ইতিহাস থেকে মোটেও

শিক্ষা নেয় নি। ১৯৯৬ সালেও খালেদা জিয়া ক্ষমতা ছাড়ার সময় এক বিশৃংখল ও ভঙ্গুর বিদ্যুৎ খাত রেখে গিয়েছিল – মাত্র ১৬০০ মেগাওয়াট ছিল উৎপাদন ক্ষমতা, আর চাহিদা ছিল প্রায় ৩০০০ মেগাওয়াট। আমরা মনে করি বিদ্যুৎ খাতের সমস্যা সমাধানে দ্রুত এবং বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেয়া অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। এ খাতে বরাদ্দ যেমন বাড়াতে হবে, ঠিক তেমনিভাবে পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রচেষ্টাও নেয়া প্রয়োজন। কারণ তা না হলে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা পুরণ করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। উল্লেখ্য যে, এ ব্যাপারে শেখ হাসিনার সরকার অনেকখানি এগিয়েছিল। কিন্তু বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতায় এসে এ ব্যাপারে আর আগায়নি বলেই মনে হচ্ছে।

৯. সর্বোপরি দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে সুশাসনের কোনও বিকল্প নেই। সরকার যদি অগ্রাধিকার নির্ধারণে ব্যর্থ হয় ; সরকার যদি অপচয় ও দুর্নীতি রোধে ব্যর্থ হয় ; সরকার যদি আইনের শাসন ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি আস্থাশীল না হয় ; তাহলে সেরকম কোন সরকারের পক্ষে দারিদ্র্য নিরসন সম্ভব নয়। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমান জোট সরকার সুশাসনের সকল সূচকে ব্যর্থতার ছাপ একে দিয়েছে। ষাটোর্ধের এক বিশাল মন্ত্রী পরিষদ নিয়ে এ সরকার যাত্রা শুরু করে। উপদেষ্টা ও সমমর্যাদার কর্মকর্তাদের নিয়ে তা ইতোমধ্যেই আশির কাছাকাছি পৌছে গেছে। মাত্র ১ লক্ষ ৪৭ হাজার বর্গ কিলোমিটারের দেশ শাসন করতে কি এত মন্ত্রী–উপদেষ্টার দরকার আছে? কি গগণচুম্বী অপচয়। আর দুর্নীতিতে তো সরকার পর পর চারবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের গৌরব অর্জন করেছে। সরকার উপজেলা নির্বাচন তো করেই নি, উপরন্তু গ্রাম সরকারের মত দৈত্য চাপিয়ে দিয়ে দুঃশাসনের হাত তৃণমূল পর্যন্ত পৌছে দিয়েছে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস (কোবরা, চিতা, র‍্যাব, সেনাবাহিনী ও পুলিশের মত বাহিনী দিয়ে বিনা বিচারে হত্যা ও নির্যাতন), সন্ত্রাসী ও জঙ্গী উত্থানে মদদদান (জেএমবি, হরকাতুল, বাংলাভাই ইত্যাদি) এবং আইন ও সংবিধান পরিপন্থী কর্মকান্ডে এ সরকারের রেকর্ড কোনও দিন কোন সরকার ভঙ্গ করতে পারবে বলে আমরা বিশ্বাস করি না। মোটকথা সরকার তার কর্মকান্ডের দ্বারা সংকট সৃষ্টি করে নি এমন কোনও খাত খুঁজে পাওয়া যাবে না। সর্বশেষ সরকার আমাদের দেশের গুরুত্বপূর্ণ খাত তৈরী পোষাক শিল্পকে সংকটে ফেলে দিয়েছে। এতকিছুর পরও সরকার ক্ষমতা আকড়ে থাকতে চাইছে এবং আগামী নির্বাচনেও ক্ষমতায় ফিরে আসার জন্যে জনগনের কাছে যাওয়ার পরিবর্তে নানা ধরনের কুটকৌশলের আশ্রয় নিতে শুরু করেছে – ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এর পদ্ধতি খুঁজছে। দেখেশুনে মনে হচ্ছে সরকার পাশ্ববর্তী দেশ নেপাল ও থাইল্যান্ডের সাম্প্রতিককালের ঘটনাবলী থেকেও কোনও শিক্ষা নিচ্ছে না। আমরা মনে করি সরকারের মধ্যে শুভ বুদ্ধির উদয় হবে এবং ক্ষমতা ত্যাগ করে একটি স্বচ্ছ, সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের পথ সুগম করে দেবে। এতে করে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ কন্টকমুক্ত হবে যা দেশকে অবশ্যই দারিদ্র্যমুক্ত করতে সাহায্য

করবে।

উপসংহার

বিএনপি–জামাত জোট সরকারের অপরিণামদর্শী সব সিদ্ধান্ত ও কর্মকান্ডের ফলে দেশ আজ এক মহাসংকটে নিপতিত হয়েছে। তারপরও সরকার ঘুম পাড়ানী ছড়ার মত উন্নয়নের জোয়ার আর প্রবৃদ্ধির গল্প শোনাচ্ছে জাতিকে। পরিস্থিতির উন্নতিতে সরকারের কোনও উদ্দ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এমতাবস্থায়, পিআরএসপির লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জন করা সম্ভব হবে না। আমরা বিশ্বাস করি যে, দারিদ্র্য নিরসনে সরকারের অতীতের সকল উদ্দ্যোগের মত পিআরএসপিও একটি ব্যর্থ প্রয়াস হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে। প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে দারিদ্র্য দূর হবে – এ তত্ত্বে বিশ্বাসী দেশগুলোর অবস্থা বাংলাদেশের চেয়ে ভাল হতে পারে না। বাংলাদেশে বিগত প্রায় সাড়ে তিন দশকে ৪% থেকে ৫% হারে প্রবৃদ্ধি হয়েছে, অথচ দারিদ্র্য তেমন একটা কমে নি। এখনও আমাদের দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ দারিদ্র্য পরিস্থিতির শিকার এবং প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষ চরম দারিদ্র্যের শিকার। অথচ ভারতে প্রবৃদ্দি ৭.০% ছাড়িয়ে গেছে এবং এখনও প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষ দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে। অপরদিকে চীনে গত প্রায় তিন দশকে প্রবৃদ্দি ১০% এর উপরে ছিল এবং দরিদ্র মানুষের অনুপাত বর্তমানে ১০% এর নীচে নেমে গেছে। চীন নিয়ন্ত্রিত বাজার অর্থনীতি চালু করে বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকের শেষ দিকে। কিন্তু সেখানে সমাজতান্ত্রিক খাত এককভাবে এখনও বৃহত্তম খাত হিসেবে (নিয়ামকী খাত) বিদ্যমান আছে। সংস্কারের ফলে সমাজে আয় বৈষম্য বেড়েছে (গিনি সহগ ০.৩৪), কিন্তু সরকার এ ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন। সরকার তার আর্থিক ও সামাজিক নীতির মাধ্যমে এ সমস্যা যথাযথভাবে মোকাবেলা করছে। আর সেকারণেই চীন দারিদ্র্য পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। ২০১০ সাল নাগাদ আশা করা হচ্ছে চীন দারিদ্র্যমুক্ত দেশ হিসেবে আবির্ভূত হবে। ভারতও সুশাসন ও সরকারের সচেতন পদক্ষেপের মাধ্যমে দরিদ্র্য পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। মনে রাখতে হবে উপরোক্ত দেশ দু'টোর সরকারের অত্যন্ত সচেতন ও পরিকল্পিত ভূমিকার কারনেই এ ক্ষেত্রে তারা সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে। অথচ বাংলাদেশে পঁচাত্তর পরবর্তী সময় থেকে মুক্ত বাজারের নামে (ব্যক্তিগত খাত, বিরাষ্ট্রীয়করণ ইত্যাদি) গোটা দেশের অর্থনীতিকে তছনছ করে দেয়া হয়েছে। যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাও পূর্ণ করেছে বর্তমান জোট সরকার ঃ পরিকল্পনাকে বাদ দিয়ে পুঁজিবাদী বটিকা পিআরএসপি গ্রহণ করেছে, যাকে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ, বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ নতুন প্যাকেটে পুরাতন ঔষধ বলে আখ্যায়ীত করেছেন (১২, পৃঃ ১১১)। আমরাও মনে করি পুঁজিবাদী দাওয়াই দিয়ে বাংলাদেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করা যাবে না। এর জন্য প্রয়োজন কুসংস্কারমুক্ত, পরিকল্পিত ও সচেতন

সরকারী উদ্দ্যোগ ।

পরিশিষ্ট ১

জাতিসংঘের সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (এমডিজি) ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ, জাতিসংঘ, সেপ্টেম্বর ২০০০

(১৯৯০ – ২০১৫ সময়ে)

লক্ষ্যসমূহ	লক্ষ্যমাত্রাসমূহ
১	২
১। চরম দারিদ্র্য এবং ক্ষুধা নির্মূল করা ;	১। প্রতিদিন এক ডলারের কম আয়ে জীবনযাপনকারী মানুষের অনুপাত অর্ধেকে নামিয়ে আনা ;
	২। ক্ষুধাপীড়িত মানুষের অনুপাত অর্ধেকে নামিয়ে আনা ;
২। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করা ;	৩। সকল বালক–বালিকার প্রাথমিক শিক্ষার পূর্ণ কোর্স সম্পূর্ণকরণ নিশ্চিত করা ;
৩। লিঙ্গ সমতা প্রবর্তন করা এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ন করা ;	৪। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় লিঙ্গ বৈষম্য পারতপক্ষে ২০০৫ সালের মধ্যে এবং সকল পর্যায়ে ২০১৫ সালের মধ্যে দূর করা ;
৪। শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করা ;	৫। পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যু হার দুই তৃতীয়াংশ হ্রাস করা
৫। মাতৃ স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধান করা ;	৬। মাতৃ মৃত্যুর হার তিন চতুর্থাংশ হ্রাস করা ;
৬। এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ;	৭। এইচআইভি/এইডস এর বিস্তার রোধ করা এবংথামিয়ে দেয়া
	৮। ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগের বিস্তার রোধ করা এবং থামিয়ে দেয়া
৭। টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করা ;	৯। টেকসই উন্নয়নের নীতিমালাসমূহকে জাতীয় নীতি ও কর্মসূচীর অঙ্গীভূত করা এবং পরিবেশগত সম্পদের ধ্বংস রোধ করা ;
	১০। স্থায়ীভাবে নিরাপদ পানীয় জলের অধিকারবঞ্চিত মানুষের অনুপাত অর্ধেকে নামিয়ে আনা ;
	১১। ২০২০ সাল নাগাদ কমপক্ষে ১০০ মিলিয়ন বস্তিবাসী মানুষের জীবন মানের যথেষ্ট উন্নয়ন ঘটানো ;
৮। উন্নয়নের জন্যে বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্বের বিকাশ ঘটানো।	১২। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে নিয়মভিত্তিক, বাস্তবানুগ ও বৈষম্যহীন মুক্ত বানিজ্য এবং আর্থিক ব্যবস্থার আরও বিকাশ ঘটানো যার মধ্যে সুশাসন, উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসের অঙ্গীকার অন্তর্ভূক্ত থাকবে ;
	১৩। স্বল্পোন্নত দেশসমূহের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি দেয়া। এর মধ্যে রয়েছে ঃ তাদের রপ্তানী পণ্যের শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার ; অত্যন্ত ঋণগ্রস্থ দরিদ্র দেশসমূহের ঋণ মৌকুফ সুবিধা বৃদ্ধি ; আনুষ্ঠানিক দ্বিপাক্ষিক ঋণ বাতিল করা এবং আরও উদারহস্তে দারিদ্র্য হ্রাসে নিবেদিত দেশসমূহকে আনুষ্ঠানিক উন্নয়ন সাহায্য প্রদান।
	১৪। ভূ-বেষ্টিত ও ক্ষুদ্র দ্বীপ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহের বিশেষ প্রয়োজনের দিকে নজর দেয়া ;
	১৫। দীর্ঘ মেয়াদে ঋণ যাতে টেকসই হয় সেজন্যে জাতীয় ও আন্ত র্জাতিক পদক্ষেপের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশসমূহের ঋণ সমস্যাসমূহ সুসমন্বিতভাবে মোকাবেলা করা ;
	১৬। উন্নয়নশীল দেশসমূহের সহযোগিতায় যুব সমাজের জন্যে যথোপযুক্ত এবং উৎপাদনশীল কাজ সৃষ্টি করা ;
	১৭। ঔষধ প্রস্তুতকারী সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় উন্নয়নশীল দেশ সমূহের জন্যে অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ সামগ্রী প্রাপ্তিযোগ্য করে তোলা
	১৮। ব্যক্তিগত খাতের সহযোগিতায় নতুন প্রযুক্তির বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুফল প্রাপ্তিযোগ্য করে তোলা।

উৎসঃ ৪ এর ভিত্তিতে অনুবাদকৃত ও প্রস্তুতকৃত।

গ্রন্থপঞ্জী

১. অর্থ মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৬।

২. অর্থ মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৫।

৩. অর্থ মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৪।

৪. MDGs Website : UN Millennium Development Goals – < >

৫. Academy of Science, USSR : Economic Encyclopedia – Political Economy, Vol. 3, << Soviet Encyclopedia >>, in Russian, Moscow, 1979.

৬. Academy of Science, USSR : History of Socialist Economy of the USSR, Vols. 1 – 7, << Nauka >>, in Russian, Moscow, 1976 – 1980.

৭. Planning Commission, Government of the People's Republic of Bangladesh : Unlocking the Potential – National Strategy for Accelerated Poverty Reduction, October, 2005.

৮. পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঃ পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৯৭ – ২০০২, মার্চ, ১৯৯৮।

৯. Planning Commission, Government of the People's Republic of Bangladesh : The Second Five Year Plan of Bangladesh 1980 – 1985, May, 1980.

১০. Planning Commission, Government of the People's Republic of Bangladesh : The First Five Year Plan of Bangladesh 1973 – 1978, March, 1973.

১১. Ahmad Q.K. : Emerging Global Economic Order and the Developing Countries, Bangladesh Economic Association and the University Press Limited, Dhaka, 2005.

১২. Ahmad Q.K. : "Poverty Reduction Strategy Paper : Repackaging Old Medicine", বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী ২০০৪, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, ঢাকা, পৃঃ ১১১ – ১১৮।

১৩. খান মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ঃ "বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়নে বাংলাদেশ রেলওয়ে ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা", ০৮-১০ ডিসেম্বর ২০০৪ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির পঞ্চদশ দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে উপস্থাপিত।

১৪. বারকাত আঃ "বাংলাদেশে দারিদ্র উচ্ছেদ ও দারিদ্র হ্রাস ঃ উদ্বেগের বিষয়", বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী ২০০৪, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, ঢাকা, পৃঃ ১০১ – ১০৯।

১৫. দৈনিক সংবাদ, ঢাকা।

১৬. দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা।

১৭. The Independent, Dhaka.